
ভবানীপ্রসাদ সাহু
সুরা শরীর সর্বনাশ
MARTINI
EXTRA DRY
MARTINI
VERMOUTH
VINO
M.R-MARTINI & ROSSI
LONDON
CAMUS

Approved for ISES
[illegible]
27/7/91

সুরা-শরীর-সর্বনাশ

সুরা-শরীর-সর্বনাশ

ডাঃ ভবানীপ্রসাদ সাহু

মণ্ডল এণ্ড সন্স

১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩

Sura-Shareer-Sarbanash
by
Dr. Bhabani Prasad Sahoo

প্রকাশক : সুধীরকুমার মণ্ডল
১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রচ্ছদ : কুমারঅজিত

প্রকাশকাল : সেপ্টেম্বর, ১৯৮৭

মূল্য : ১৫.০০ (পনের টাকা মাত্র)

মুদ্রক : শ্রীআনন্দমোহন দত্ত
নারায়ণী প্রেস
২৬সি, কালিদাস সিংহ লেন,
কলিকাতা-৭০০০০৯

বিষয় সূচী

মুখবন্ধের পরিবর্তে
ড্রাগ ও অ্যালকোহল

সুইস লেক অঞ্চলের বাসিন্দা, নব্যপ্রস্তর যুগের* মানুষের রান্নাঘরে আফিমের খোসার উপস্থিতি দেখে অনেকে অনুমান করেন যে, 'ড্রাগ'-এর নেশার ব্যাপারটি নেহাত হাল আমলের নয়। হয়তো ঘটনাচক্রে ঐ আদিম মানব এধরনের জিনিস খেয়ে কিছু 'ভাল লাগার' অভিজ্ঞতা লাভ করে। তারপর ধীরে ধীরে নেশার ব্যাপারটি চলে আসে। তবে অভিজ্ঞতাতেই মানুষ বুঝেছে, এসব নেশা তার শরীর ও সমাজের পক্ষে হিতকারী মোটেই নয়। আর নেশায় বুঁদ হয়ে পড়ে থাকার সময়ও তার ছিল না, প্রকৃতির সঙ্গে নিরন্তর সংগ্রাম করেই তাকে বেঁচে থাকতে হয়েছে। নেশার সাহায্যে দুঃখ ভুলে থাকা বা পলায়নী মনোবৃত্তির প্রয়োজনীয়তাও তখন ছিল না। সব মিলিয়ে এ ধরনের ড্রাগের নেশা ব্যাপক হয়ে ওঠেনি,—হলে মানুষ প্রকৃতির উপর আধিপত্য বিস্তার করে বর্তমান স্তরে উঠে আসতে পারত না।

তারপর কেটে গেছে কতকাল। মানুষের জ্ঞান বেড়েছে, অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ হয়েছে। চিকিৎসা-তথা শারীর-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও মানুষ ওষুধ বা ড্রাগ সম্পর্কে যুগান্তকারী সব তথ্য আহরণ করেছে। উইলিয়াম উইদারিং ২০০ বছর আগেই মন্তব্য করেছিলেন, 'বিষ স্বল্প মাত্রায় প্রয়োগ করা হলে তা উপকারী ওষুধ, কিন্তু উপকারী ওষুধ বেশী মাত্রায় প্রযুক্ত হলে তা বিষ।' উপকারী এইসব ওষুধপত্র বা রাসায়নিক পদার্থগুলি কিছু মানুষ অপব্যবহারও করেছে। চিকিৎসার স্বার্থে নয়, আপাত কিছু আনন্দের অভিজ্ঞতা লাভ করা তথা দৈনন্দিন জীবনের নানা টানাপোড়েন থেকে সাময়িক মুক্তির আশায় কিছু মানুষ কিছু পদার্থকে কাজে লাগিয়েছে—যা ব্যক্তিবিশেষের শারীরিক-পারিবারিক ক্ষেত্রেই শুধু আত্মহননের পথ পরিষ্কার করেছে তা নয়, সেটি সামগ্রিকভাবে তার সমাজকেও ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। প্রচলিত অর্থে এগুলিকে 'ড্রাগ' নামে ডাকা হয়।

চিকিৎসার স্বার্থ ব্যতিরেকে 'ড্রাগ' ব্যবহার করার অর্থ, কোন ব্যক্তি

---

* এ যুগের সময়কাল এখন থেকে প্রায় ১০-১২ হাজার বছর আগে।

বিশেষের দ্বারা মাঝে মাঝে বা নিয়মিত, নিজের ইচ্ছায় বা পছন্দ অনুযায়ী, শুধুমাত্র নিজের ভাল থাকার জন্য অথবা যাকে শুধু সে-ই মনে করে 'ভাল থাকা' তার জন্য, অথবা কোন অভিজ্ঞতা লাভ করার উদ্দেশ্যে কিংবা নিছক কৌতূহল বশতঃ,—শরীরে গ্রহণ করে। এভাবে 'ড্রাগ' ব্যবহার করার উদ্দেশ্যগুলিকে এভাবে ভাগ করা যায়—

১। উদ্বেগ, উত্তেজনা ও হতাশা থেকে মুক্তি পাওয়া ; নিজের মানসিক সমস্যাবলী থেকে পলায়নী মনোভাব।

২। ধর্মীয় চেতনা সহ, আত্মোপলব্ধি ও জীবনের অর্থ খুঁজে পাওয়ার জন্য। ঈশ্বরোপলব্ধি, শিল্পগত প্রতিভার বিকাশ, যৌন উত্তেজনা—এসবের নাম করে এবং 'যথার্থ', 'আন্তরিক' সম্পর্ক গড়ে তুলে বিচ্ছিন্নতা কাটানোর উদ্দেশ্যে।

৩। সংস্কারাবদ্ধ সামাজিক মূল্যবোধ ও পরিবেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী মনোভাব বা হতাশা।

৪। কোন কিছু হারানোর ভয় এবং নিজ গোষ্ঠীর অন্যান্যদের সমকক্ষ হওয়ার তথা জাতে ওঠার আশা।

৫। মজা, আনন্দ, ফূর্তি, উত্তেজনা, ঔৎসুক্য।

চিকিৎসার স্বার্থ ব্যতিরেকে যে সব ড্রাগ ব্যবহার করা হয় তাদের দু'ভাবে ভাগ করা যায়—(১) হার্ড (Hard) ঃ হিরোইন, মরফিন এবং ঐ জাতীয় পদার্থগুলি। এগুলি দ্রুত আবেগগত (emotional) ও শারীরিক নির্ভরতা (physical dependence) সৃষ্টি করে এবং সমাজের সক্রিয় সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে ব্যবহারকারীকে অক্ষম করে দেয়। ২। সফ্‌ট্‌ (soft)—ঘুমের ওষুধ, মদ বা অ্যালকোহল, গাঁজা, অ্যামফিটামাইন, তামাক, মানসিক ভ্রম সৃষ্টিকারী ওষুধ (hallucinogen)।* এদের ওপর আবেগগত নির্ভরতা হয়, তবে শারীরিক নির্ভরতা বেশী হয় না। কিন্তু এগুলিও অতিরিক্ত পরিমাণে ব্যবহার করলে শারীরিক নির্ভরতা চলে আসে, যেমন অ্যালকোহল ও ঘুমের ওষুধ। সেক্ষেত্রে এগুলিও কার্যকারিতার দিক থেকে হার্ড ড্রাগে পরিণত হয়।

অ্যালকোহলের ক্ষেত্রে এ ধরনের পরিবর্তন খুবই সহজ ও সাধারণ

(* Clinical Pharmacology, Laurence-Bennet, 1982)

ঘটনা। এছাড়া রয়েছে শরীরের প্রায় প্রতিটি অংশে এর ক্ষতিকর প্রভাব, ফলে এর থেকে শারীরিক-সামাজিক ক্ষতি হিরোইন-মরফিনের মত হার্ড ড্রাগ থেকে মোটেই কম নয়, বরং সংখ্যাগত বিচারে বহুগুণ বেশি। (আমাদের দেশের কিছু পরিসংখ্যানের জন্য 'সুরা ও সমাজ' অধ্যায় দ্রষ্টব্য।) সফ্‌ট্‌ ড্রাগ হওয়ার সুবাদে এর অপব্যবহারের সম্ভাবনা অনেক অনেক বেশি। এর কিছুটা সামাজিক স্বীকৃতিও রয়েছে। আর শুল্ক হিসেবে অর্থোপার্জনের সুযোগ থাকায় ফলে এর বিক্রি ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে সরকারি আইনের প্রশ্রয়ও আছে। সব মিলিয়ে মদের কারণে সামাজিক-শারীরিক বিপদ অতি ভয়াবহ। তবু আমাদের দেশে সম্প্রতি হিরোইনের মত হার্ড ড্রাগের বিরুদ্ধে যতটা সরকারী-বেসরকারী সচেতনতা ও সক্রিয়তা দেখা যাচ্ছে, মদের মত 'সফটের মুখোশে হার্ড ড্রাগ'-এর বিরুদ্ধে সক্রিয়তা ততটা জোরদার নয়। এর বড় একটি কারণ হিরোইনের মত ড্রাগগুলি সবসময়েই 'হার্ড'—অল্প মাত্রাতেও তা একজনকে শারীরিক-মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করে তোলে, অতি দ্রুত সামাজিক সম্পর্ক, ব্যক্তিত্ব-কর্মকুশলতাকে নষ্ট করে এবং অতি দ্রুত নেশা সৃষ্টি করে। আরেকটি কারণ দামী এই নেশার শিকার মূলত অভিজাত, ধনী বাড়ির ছেলেমেয়েরা। (তবে স্বাভাবিক ব্যতিক্রম হিসেবে—রিক্সাওয়ালা, ঝাড়ুদার ইত্যাদির মত কিছু গরীব মানুষও এ নেশার শিকার হচ্ছেন।) অন্যদিকে মদের নেশার কারণে সর্বদিক থেকে যারা সবচেয়ে বেশি বিপর্যস্ত হয় তারা হল দেশের গরীব মানুষেরা। ধনীরা উপযুক্ত খাবার দাবারের কারণে সুরাজনিত শারীরিক ক্ষতি যেমন অনেকটা সামাল দিতে পারে, তেমনি আর্থিক দিক থেকে স্বচ্ছল অবস্থায় থাকার জন্য পারিবারিক ও আর্থিক বিপর্যয় এড়ানোর ক্ষেত্রেও সুবিধাজনক অবস্থায় থাকে। কিন্তু হিরোইনের মত হার্ড ড্রাগের কারণে যে ক্ষতি হয় তা আর্থিক সমস্যার চেয়েও, ঐসব অভিজাত পরিবারের ছেলেমেয়েদের যে শারীরিক, মানসিক ক্ষতি করে তাকে সামাল দেওয়ার ক্ষেত্রে খাবার-দাবারের প্রায় কোন ভূমিকাই নেই, উপরন্তু নিজেদের আর্থিক সামাজিক উন্নতির পথে, তথা সমাজে আধিপত্য করার উপযুক্ত হয়ে ওঠার পথে, বাধাস্বরূপ হয়ে যায়। তাই কিছু সংখ্যক হিরোইন-আসক্তদের জন্য যে উদ্যোগ, যে আন্তরিকতা (যারও প্রয়োজন অবশ্যই রয়েছে) দেখা যাচ্ছে, তার সামান্যই রয়েছে

অতি বিপুল সংখ্যার সুরাসক্ত দরিদ্র শ্রমিক, বস্তি বা গ্রামবাসী বা আদিবাসীদের জন্য। বরং তাদের কাছে মদকে আরো সহজলভ্য করে তোলা হচ্ছে, সামাজিক সমস্যা আর চাহিদাও বেড়ে চলেছে। অবশ্য এ ধারা এখনকার নয়, মনুসংহিতাতেও নানা বিধিনিষেধ আরোপ করে সুরাসক্তি থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করা হয়েছে শুধুমাত্র দ্বিজাতি অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যদের তথা অভিজাত, ধনী, শাসক সম্প্রদায়কে। চতুবর্ণের শেষ বর্ণ, বিপুল সংখ্যার শূদ্র বা দাসদের জন্য 'ভৃগু' বা 'মনু' এতটা চিন্তিত ছিলেন না। ('সুরা ও আইন' অংশটি দ্রষ্টব্য।) এই একই ধারা এখনো অব্যাহত। পাশাপাশি হিরোইনের মত পদার্থ থেকে সরকারি আবগারী আয় না হওয়ার ব্যাপারটিও হয়তো রয়েছে।

উপযুক্ত সতর্কতা না নিলে অ্যালকোহল ধনী দরিদ্র সবার ক্ষেত্রেই একই শারীরিক বিপদ ডেকে আনে, যদিও দরিদ্রদের মধ্যে এ ধরনের সতর্কতা নেওয়ার সুযোগ কম, তাই বিপদও বেশি। দরিদ্র বা নিম্নবিত্ত পরিবারে মদের কারণে চরম সর্বনাশ ঘনিয়ে আসা ছাড়াও, সামগ্রিকভাবে মদের নেশা পুরো সমাজকেই ক্ষতিগ্রস্থ করে। সবচেয়ে বড় ক্ষতি, নেশায় বুঁদ হয়ে থেকে সামাজিক সমস্যাবলীর প্রকৃত সমাধানের ক্ষেত্রে, নিজের দাবি ও অধিকার আদায়ের সংগ্রামের পথ থেকে বিপথগামী হওয়া। মূলতঃ এভাবে ভুলিয়ে রাখার জন্য শাসকশ্রেণী আন্তরিকভাবে চায় না মদের যোগান ন্যূনতম হোক (যৌন উত্তেজক চলচ্চিত্র পত্র-পত্রিকার যোগানও)। এছাড়া কর্মদক্ষতা ও মননক্ষমতার হ্রাস, মানবিক মূল্যবোধগুলির অবনতি ইত্যাদি তো রয়েইছে। এই শারীরিক ও সামাজিক বিপদগুলি সম্পর্কে কিছুটা ওয়াকিবহাল করারই চেষ্টা করা হয়েছে এই বইতে। শারীরিক বিপদের চেয়ে সামাজিক বিপদ আরো বেশি ভয়াবহ, এ ব্যাপারে সচেতন হওয়া দরকার। সচেতন হওয়া দরকার এ ব্যাপারেও যে,—যে সমস্ত সামাজিক অর্থনৈতিক কারণে লোকে অ্যালকোহল-হিরোইনের মত নানা ধরনের ড্রাগের আশ্রয় নেয় বা নিতে বাধ্য হয়, এবং এ ধরনের নেশা ক্রমবর্ধমানভাবে টিকে থাকে সেই সব কারণগুলিকে দূর করাটাই বেশি জরুরি। আসক্তদের শারীরিক চিকিৎসাটার প্রয়োজন আছেই, তবে সমস্যার স্থায়ী ও কার্যকরী সমাধানের জন্য পাশাপাশি প্রয়োজন আসক্তির সামাজিক চিকিৎসা। এদিকে সামান্যতম দৃষ্টিপাত না করে সুরাসক্ত বা

হিরোইন আসক্তদের নিছক শারীরিক চিকিৎসা করার জন্য নানা উদ্যোগ নেওয়া প্রকৃতপক্ষে আসল সমস্যাকে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা মাত্র। সরকারি সংস্থা থেকে শুরু করে, ধর্মীয় কলুষ ছড়ানো আন্তর্জাতিক খ্যাতির নানা প্রতিষ্ঠানসহ বেসরকারি সংস্থাগুলির প্রায় সবাই শুধু আসক্তদের চিকিৎসার জন্য এভাবেই কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জন করে ও তার মাধ্যমে সুনাম অর্জনের চেষ্টা করে। যে ব্যবস্থা এ ধরনের আসক্তির মূলে দায়ী সেই ব্যবস্থাকে আঘাত না করে, বরং তাকে টিকিয়ে রাখার জন্য সচেষ্ট ও সক্রিয় থেকেই, এরা মূল সমস্যার উপর নিছক প্রলেপ দেওয়ার কাজ করে আসক্তদের চিকিৎসার জন্য সক্রিয়তা দেখিয়ে।

এ বইটি থেকে এই সামাজিক দায়িত্ব সচেতনতা কিছু জনের মধ্যেও যদি জাগে তবেই এর সার্থকতা। কিছু জনও যদি সুরা বা এ ধরনের নেশার শারীরিক, পারিবারিক, সামাজিক বিপদের বিরুদ্ধে সক্রিয় হন, তবেই পরিশ্রম সার্থক হয়। এ বইতে সুরাসক্তির চিকিৎসার উপরেও কিছু আলোকপাত করা হয়েছে, যাতে ভুক্তভোগীরা উপকৃত হতে পারেন। এই চিকিৎসার অনেকখানিই হিরোইনের মত ড্রাগের ক্ষেত্রেও প্রাসঙ্গিক।

সরকারিভাবেও কিছু কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ প্রত্যাশিত। যেমন—(১) মদের প্রতিটি বোতলের গায়ে বিপদজ্ঞাপক খুলিচিহ্ন দিয়ে "মদ্যপান স্বাস্থ্য ও সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর" ("Alcohol is injurious to health & society") কথাগুলি লেখা হোক। একই সঙ্গে—দায়সারা প্রচারের পরিবর্তে, বিশেষত নিম্নবিত্ত ও গরীবদের মধ্যে, এ ব্যাপারে কার্যকরী ও ব্যাপক প্রচার চালানো হোক।

(২) চুল্লু-চোলাই বা নানা দেশী মদের যে সব বেআইনী কারখানা ও ঠেক চলে সেগুলি কঠোরভাবে বন্ধ করা হোক। এগুলি অধিকাংশই চলে কিছু রাজনৈতিক নেতা ও পুলিস প্রশাসনের মদতে।

(৩) মদ্য উৎপাদনের মাত্রা চূড়ান্তভাবে কমানো হোক ও ন্যূনতম করা হোক এবং শুধুমাত্র সরকারি নিয়ন্ত্রণে আনা হোক। মদ বিক্রি করে আবগারি আয় করা বা বাড়ানোর আশা পরিত্যাগ করা দরকার।

(৪) আইনী-বেআইনী এইসব যে কারখানা বন্ধ করা হবে তাদের কর্মচারীদের বিকল্প কাজের ও সুষ্ঠু পুনর্বাসনের ব্যবস্থা একই সঙ্গে করা দরকার।

(৫) মেডিক্যাল কলেজ থেকে মহকুমা হাসপাতাল পর্যন্ত—প্রতিটি স্তরে সুরাসক্তি ও তার কারণে শারীরিক অসুস্থতার চিকিৎসার বিশেষজ্ঞ ব্যবস্থার চালু করা হোক। সুরাসক্তদের সামাজিক পুনর্বাসন ও সুস্থ উন্নততর জীবনযাপনের ব্যবস্থা করাও প্রয়োজন।

(৬) দু' পেগের বেশি মদ খাওয়া এবং প্রকাশ্যে বা গোপনে মদ খেয়ে মাতাল হওয়া বেআইনী ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসাবে গণ্য করা হোক। ডাক্তারের সার্টিফিকেট এবং সঙ্গে স্বামী-স্ত্রী-পুত্র-কন্যা বা অনুরূপ আত্মীয়ের সম্মতিপত্র ছাড়া বিশেষ ব্যক্তির নিয়মিত মদ্যপানও নিষিদ্ধ করা হোক। (এবং বিশেষজ্ঞদের সাহায্যে অনুরূপ আরো কিছু ব্যবস্থা নেওয়া যায়।)

(৭) রাজনৈতিক সংকীর্ণতা ছেড়ে বিভিন্ন স্তরের মানুষদের নিয়ে সুরাসক্তির সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কারণগুলিকে খুঁজে বের করার কার্যকরী উদ্যোগও নেওয়া প্রয়োজন। কোন্ ধরনের সমাজ ব্যবস্থায় এধরনের নেশা রোধ করার পরিমণ্ডল গড়ে তোলা যায়, সে সম্পর্কে সরকারি-বেসরকারি প্রচার ও আন্দোলনও সংগঠিত করা দরকার।

(৮) মদ্যপান বিরোধী যে কোন আন্দোলনের স্বপক্ষে সরকারি সাহায্য দেওয়া এবং তার বিরুদ্ধে যে কোন অপচেষ্টাকে সাহায্য না করার আন্তরিকতা থাকা প্রয়োজন। ইত্যাদি।

আন্তরিকতা থাকলে এধরনের উদ্যোগ নেওয়া আদৌ অসম্ভব নয়। যে উদ্যোগে অনুৎপাদক খাতে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে অল্প সময়ে নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়াম বা এসিয়াডের আগে দিল্লীশহর সাজিয়ে তোলা যায় কিংবা যে আন্তরিকতায় অতি দ্রুত ও দক্ষভাবে রাষ্ট্রদ্রোহী কোন বিপ্লবীকে চিহ্নিত করে নিশ্চিহ্ন করা সম্ভব হয়, সেই উদ্যোগ ও আন্তরিকতার সামান্য অংশই প্রয়োজন এসব জনমুখী কাজ করতে। এবং প্রকৃতপক্ষে এর ফলে পরোক্ষভাবে দেশের সম্পদ ও উৎপাদনও বৃদ্ধি পাবে। আবগারি আয় কমা, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসার খরচ বাড়া কিংবা পুনর্বাসনের ব্যয় বহন করা—এসবের মোট আর্থিক মূল্যের বহুগুণ জাতীয় আয় হবে, যদি, মদের কারণে যে শ্রমদিবস নষ্ট হয়, যে উৎপাদনক্ষমতা ও সৃজনশীলতা হ্রাস পায়, চিকিৎসার পেছনে বাড়তি খরচ হয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জটিলতার সৃষ্টি হয়—এগুলি ন্যূনতম হয়ে যায়।

তবু এগুলি কেন হচ্ছে না তা সাধারণ মানুষকেই ভেবে দেখতে হবে। এই ভাবনায় কিছুটা সাহায্য যোগালেও এ বই-এর সার্থকতা।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

বইটি তৈরি ও প্রকাশের ক্ষেত্রে প্রকাশক বন্ধু শ্রীশংকর মণ্ডলের আন্তরিক উদ্যোগ ও উৎসাহ অত্যন্ত প্রশংসার্হ—সমস্ত সৌজন্যমূলক কৃতজ্ঞতা বিনিময়ের ঊর্ধ্বে। ডঃ অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ আরতি সাহু (চট্টোপাধ্যায়), অধ্যাপক দেবকুমার গিরি, ডঃ সত্যবতী গিরি, শ্রীবিমল সিকদার—এঁরাও নানাভাবে সাহায্য করেছেন। ব্যবহৃত ছবিগুলির ৫টির ক্ষেত্রে সাহায্য নেওয়া হয়েছে ইণ্ডিয়া টুডে ও ক্লিনিক্যাল ফার্মাকোলজি (লরেন্স-বেনেট)-এর।

কৃতজ্ঞ থাকব সেই সব পাঠক বন্ধুদের কাছে যাঁরা বইটির অসম্পূর্ণতা ও অসঙ্গতিগুলি দেখিয়ে দেবেন, ত্রুটিগুলি খোলামনে জানাবেন।

১লা সেপ্টেম্বর ১৯৮৭.

ভবানীপ্রসাদ সাহু

সোমরস থেকে অ্যালকোহল

আর্যরা ভারত ভূখণ্ডে যেখান থেকেই আসুন না কেন, তাঁদের কাছে উত্তেজক সোমরস যে অতি প্রিয় এক পানীয় তথা নেশার সামগ্রী ছিল তা কারোর অজানা নয়। ঋগ্‌বেদে সোম নামে এক লতাজাতীয় গাছের উল্লেখ পাওয়া যায়। জন্মাত মুজবান পর্বতে। এই লতা একটু গরম করে পাথরে ছেঁচে সোমরস বের করানো হত। দশ আঙুলে নিংড়ে আর ভেড়ার চুল থেকে তৈরি তনা নামে এক ধরনের ছাঁকনিতে ছেঁকে দুধের সাথে মিশিয়ে খাওয়া হত সোমরস। এর রঙ সাদা, স্বাদ সামান্য টক এবং এটি অবশ্যই মাদকতার সৃষ্টি করে, উত্তেজক। ঋগ্‌বেদের নবম মণ্ডলের পুরোটা জুড়ে, ১২০টি সূক্তের মাধ্যমে এই সোম তথা সোমরসের মহিমা বর্ণনা করা হয়েছে। পূজা ও যজ্ঞে এটি ছিল অত্যাবশ্যক। একে বলা হত সর্বরোগ নাশক, ধনরত্ন প্রদায়ক, অমরত্ব প্রদানকারী ইত্যাদি। বাস্তবে দেবতারা থাকুন বা না থাকুন, প্রাচীন আর্যসাহিত্যে দেবতাদের অতি প্রিয় এক পানীয় হিসেবে সোমরসের উল্লেখ করা হয়েছে। মুনি-ঋষিরাও অবশ্যই খেতেন।

দেবতাদের রাজা ইন্দ্রের বিশেষ প্রিয় ছিল সোমরস। কামুক ও ঈর্ষাপরায়ণ ছাড়াও সোমরস-লোভী হিসেবেও ইন্দ্রের যথেষ্ট পরিচিতি ছিল। ঋগ্‌বেদে উল্লেখ আছে ইন্দ্র জন্মেই নাকি মা অদিতির স্তনে সোমরস দেখে। বাবা ত্বষ্টার সোমরস সে জোর করে খেয়ে ফেলে। ইন্দ্র নাকি এক চুমুকে ত্রিশ হ্রদ সোমরস পান করতে পারত। মাদকতাকারী, উত্তেজক এই পানীয় খেয়ে খেয়ে তার পেট মোটা (ভুঁড়ি) হয়ে গিয়েছিল, দাড়িতে হয়ে গেছিল জটা। সোমরস রাখার ঘটের অন্য নামই হয়ে গিয়েছিল ইন্দ্রোদর। সোমরস পান করে উত্তেজিত ও শক্তিশালী হয়ে ইন্দ্র বৃত্র সংহার করতে পেরেছিল। বেদ-পুরাণের অন্যত্রও নানা দেবতার ও মুনি ঋষিদের সোমরস পানের বর্ণনা রয়েছে।

প্রাচীন এই সোমরসের সাথে এখনকার মদ বা অ্যালকোহলের বেশ মিল দেখা যায়—অন্তত নেশার দিক থেকে। তবে সোমরস আর মদ একই জিনিস বলে যে বহুল প্রচলিত ধারণা রয়েছে তা ঠিক নয়। অনেকের মতে সোমরস ভাঙ বা সিদ্ধি জাতীয় কোন জিনিস ছিল। তবে এটি ঠিকই—এটি ছিল

এখনকার মদেরই প্রায় বিকল্প। সোমলতা ঠিক কি ছিল তা এখন সুনির্দিষ্টভাবে জানা নেই। প্রাচীনকালে ইরান অঞ্চলেও যাগযজ্ঞে সোমরসের ব্যবহার দেখা যায়। এখনো ভারতের পার্সীরা নানা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে সোমরস ব্যবহার করেন—এটি তৈরি হয় এফিড্রা গাছ থেকে, যার থেকে এফিড্রিন নামের ওষুধ পাওয়া যায়। পার্সীরা সোমকে বলেন 'হওম' ('স' স্থলে 'হ' —যেমন সিন্ধু থেকে হিন্দু)।

ঋগ্‌বেদের অনেক পরবর্তীকালের ঐতরেয় ব্রাহ্মণে স্পষ্ট বলা আছে মদ বা সুরা এবং সোমরস আলাদাই। খুবসম্ভব পরের দিকে পার্বত্য সোমলতা দুষ্প্রাপ্য হয়ে পড়ে। তাই যাগযজ্ঞে সুরা ও সোমরস একত্রে ব্যবহারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে বিশেষ নিয়ম মেনে সুরা ব্যবহার করলেও তা সোমরস পানের মতই হবে।

প্রাচীনকালে সোমরস বা সুরা—যাই হোক না কেন, নেশা করার জন্য পানীয়ের ব্যবহার যে বিশেষত ধনী ও উচ্চবংশীয়ের মধ্যে বেশ ভালভাবেই চালু ছিল তা স্পষ্ট। রামায়ণে রয়েছে কিভাবে হনুমান মদ খেয়ে মধুবনে মাতাল হয়েছিলেন। বিভিন্ন জন বিভিন্ন ধরনের মদও খেতেন। ক্ষত্রিয় ও সম্ভ্রান্তদের মধ্যে মদ্যপান বিলাস-ব্যসনের অন্যতম অঙ্গ ছিল। বলরাম এমন কড়া করে খেতেন যে, অনেক বীরপুরুষরাই তা খেতে সাহস করতেন না। বলরামের সুরাপাত্রে আবার সব সময় তাঁর স্ত্রীর চোখের ছায়া নাকি ভাসত। তবে মেঘদূতে আছে বলরাম সুপেয় সরস্বতী নদীর জল খেতেন, মদ ফেলে।

মনু অবশ্য তাঁর সংহিতায় রাজাকে দশ কামজ ব্যসন থেকে মুক্ত থাকতে বলেছিলেন। এদের অন্যতম ছিল মদ্যপান (বাকী নয়টি হল—মৃগয়া, অক্ষক্রীড়া, দিবানিদ্রা, পরচর্চা, কামিনী, বাদ্য, নৃত্য,গীত ও অর্থহীন পর্যটন)। স্পষ্টতঃই বিলাসী রাজারা এ নির্দেশ মানেন নি। তবে এটি স্পষ্ট—মদ্যপান যে ব্যক্তি ও সমাজের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর ছিল—সে ধারণাটি ছিল পরিষ্কার। তবু তথাকথিত ধর্মগ্রন্থগুলিতে ব্যভিচার, উচ্ছৃঙখলতা ও বিলাসব্যসনের অন্যতম অঙ্গ হিসেবে সুরাপানের বহু বর্ণনা পাওয়া যায়। রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে রয়েছে, ভরদ্বাজ মুনি ভরতকে চিত্রকূট যাওয়ার পথে যে আপ্যায়ন করেন ও ভোজ দেন তাতে উত্তম সুরা, সুরূপা নারী ও মাংসাদির বিপুল আয়োজন ছিল। এই অযোধ্যাকাণ্ডেই

আছে সীতা বনবাসে যাবার পথে মা-গঙ্গার কাছে মাংসভাত ও সহস্র ঘট সুরা দিয়ে ফেরার পথে পুজো করবেন বলে মানত করেন। সীতা জীবিত রয়েছেন—এই খবরটি নিয়ে ফেরার পর খুশি হয়ে সুগ্রীব ও অঙ্গদ বানর সৈন্যদলকে মধুবনে ফুর্তি করার অনুমতি দেন। তখনই মদ-টদ খেয়ে হনুমান সহ অন্যান্য বানররা মধুবন তছনছ করে। হনুমান লঙ্কা থেকে ফিরে রাবণের ভাঁড়ার ঘরের বর্ণনায় প্রচুর সুরার উপস্থিতিও উল্লেখ করে।

সাঁওতালদের মধ্যে পৃথিবী ও মানুষের সৃষ্টি সম্পর্কে যে ধারণা রয়েছে তাতে দেখা যায়, তাঁদের ঠাকুর পৃথিবী সৃষ্টি করে হাড়াম ও আয়ো নামে আদিম নর-নারীর সৃষ্টি করেন। এরা দু'জন একরাত্রে প্রচুর হাঁড়িয়া খেয়ে একসাথে শোন। তারপরেই মানুষের সৃষ্টি।

শুধু ভারত ভূখণ্ডেই নয় প্রাচীন সব সভ্যতাতেই মদের নেশা ও মদের ব্যবহারের উল্লেখ পাওয়া যায়। মিশরীয়রা তাদের দেবতা আসিরিস-এর উদ্দেশ্যে সুরা নিবেদন করত—সে প্রায় ৬০০০ বছর আগেকার কথা। রোমান-গ্রীকরাও তাদের দেবতা বাক্‌কাস-ডিওনিসাসকে সুরার অর্ঘ্য দিয়ে সন্তুষ্ট রাখার চেষ্টা করত। বাইবেলে বিভিন্ন নামে একে দেখা যায়—ইয়ায়িন (ওয়াইন), হোমার, টিরোস, মেসেগ, সেখর ইত্যাদি। এদের মধ্যে টিরোস ও সেখর ছিল খুব কড়া। চরক ও সুশ্রুতেও নানা ধরনের মদের নাম পাওয়া যায়। চরকে প্রায় ৮৪ ধরনের মদ (সন্ধিত পানীয় বা আসব)-এর উল্লেখ রয়েছে। যে সব জিনিস থেকে তা তৈরি হত ঐ অনুযায়ী এদের নাম হত, যেমন, ধান্যাসব, ফলাসব, পুষ্পাসব, মূলাসব, শর্করাসব ইত্যাদি।

এখনও মদ বা অ্যালকোহল মাত্রাভেদে বিভিন্ন নামে পাওয়া যায়। মদের ব্যবহার প্রাচীন হলেও অ্যালকোহল নামে এর আন্তর্জাতিক পরিচিতিটা এই হাল আমলের—মাত্র হাজার খানেক বছর ধরে। কথাটি এসেছে আরবী থেকে। আরবীয়রাই প্রায় ৮০০ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ ব্যাপকভাবে এটি প্রস্তুত করে এবং মূলত ইয়োরোপে এর বেশ লাভজনক ব্যবসা গড়ে তোলে।

আরবী অ্যাল (al)-এর অর্থ 'the' এবং কোহল (kohl)-এর মূল অর্থ ছিল এ্যাণ্টিমনির মিহি গুঁড়ো, পরে যে কোন অতি সূক্ষ্ম গুঁড়োকে বোঝাতেই কথাটি প্রয়োগ করা হত এবং সব শেষে অর্থ পরিবর্তিত হয়ে সূক্ষ্ম, যা কিছুকে অনুভব করা যায় না (যেমন স্পিরিট, যা চট করে উবে

যায়) তার জন্যই শব্দটি ব্যবহার করা হতে থাকে। কথাটি আরবী থেকে এলেও বা আরবীয়রা এর ব্যাপক ব্যবসা করলেও আরবের মক্কার হজরত মহম্মদ (জন্ম ঃ ২৯শে আগষ্ট, ৫৭০ খ্রীষ্টাব্দ) কিন্তু মদকে অনিষ্টকারী, অপবিত্র শয়তানের জিনিস তথা হারাম বলে বর্ণনা করেছেন এবং এ থেকে মুক্ত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। (প্রকৃত পক্ষে এ সব নির্দেশ ইসলাম ধর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ পুস্তক কোরআন শরীফে লিপিবদ্ধ রয়েছে অর্থাৎ সেগুলিকে আল্লাহ্ বা ঈশ্বরের ওহী বা নির্দেশ বলেই বিশ্বাস করা হয়।) তাবলে ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা একেবারেই মদ খান নি বা খান না তা বলা যায় না। বাবর, হুমায়ুন, জাহাঙ্গীর, ওয়াজিদ আলি শাহ-এর মত নবাব বাদশার সুরাসক্তি ঐতিহাসিকভাবেই অবিতর্কিত। এমনকি নূরজাহানের মত মহিলারাও মদ খেতেন। এখনো আমাদের চারপাশেই এ ধরনের ইসলাম-ধর্মাবলম্বীর উদাহরণ কম নেই।

বাংলায় মদের নানা প্রতিশব্দ প্রচলিত আছে যেমন, মদিরা, সুরা, মদ্য, আসব ইত্যাদি। এগুলি মূল সংস্কৃত শব্দ। 'সু' কথার অর্থ 'মত্ততা প্রসব করা' ; সুরা—যে মত্ততা জন্মায় [সু+র (তৃ) আ (স্ত্রীং)]। সুরার ভিন্নতর অর্থ আবার কস্তুরী। তেমনি মদ-এরও ভিন্নতর অর্থ রয়েছে, যেমন এটি ষড়রিপুর একটি দম্ভকে বোঝায়, 'হস্তীর রগ ফাটিয়া যে পাটকিলা বর্ণের উৎকট গন্ধ জলস্রাব হয়' তাকেও বোঝায়, আবার 'উন্মাদ জনিত মৃগগণ্ডস্থল হতে নিঃসৃত স্বেদ'কেও বোঝায়।

সাধারণভাবে মদ মানেই অ্যালকোহল বলে ধারণা থাকলেও, খাওয়ার মদ মানেই অ্যালকোহল নয়। অ্যালকোহল এক জাতীয় জৈব রাসায়নিক পদার্থ যাতে হাইড্রোকার্বনের হাইড্রোজেন (H) হাইড্রক্সিল (OH) দিয়ে প্রতিস্থাপিত হয়েছে। এবং সেটি অ্যাসিডের সাথে বিক্রিয়া করে এস্টার তৈরি করতে পারে। এইভাবে বহু অ্যালকোহল রয়েছে, যেমন মিথাইল অ্যালকোহল, ইথাইল অ্যালকোহল, প্রপাইল অ্যালকোহল ইত্যাদি। এদের মধ্যে ইথাইল অ্যালকোহলই খাওয়ার মদ। তবু সাধারণ ব্যবহারের বা খাওয়ার জন্য যে সব পানীয়ে শুধু ইথাইল অ্যালকোহল থাকে তাকেই অ্যালকোহল (মদ বা সুরা) নামে অভিহিতও করা হয়। আর ইথাইল অ্যালকোহলকে পানের অযোগ্য করতে তার সাথে বিষাক্ত মিথাইল অ্যালকোহল মেশান হলে তাকে বলা হয় ডিনেচারড্ অ্যালকোহল ; এতে

মোট পরিমাণের (by volume) নয় ভাগের একভাগ মিথাইল অ্যালকোহল থাকে, আর থাকে সামান্য কিছু বেঞ্জিন বা পিরিডিন। হাসপাতালে ব্যবহার্য অ্যালকোহলে একই উদ্দেশ্যে মারকিউরোক্রোম, এক্রিফ্লেবিন ইত্যাদি মিশিয়ে দেওয়া হয়। এখানে মদ বা অ্যালকোহল বলতে ইথাইল অ্যাল-কোহলকে (CH_3CH_2OH) বোঝান হবে।

চিকিৎসাক্ষেত্রে ইথাইল অ্যালকোহলের ব্যবহারও বহুদিনের। ইথার আবিষ্কারের পূর্বে অস্ত্রোপচারের সময় অ্যানেস্থেশিয়ার জন্য এর ব্যবহার করা হত এবং আফিঙের সাথে মিশিয়ে ব্যথা কমানোর উদ্দেশ্যেও ব্যবহৃত হয়েছে একসময়। জীবাণুনাশক হিসেবেও এর ব্যবহার রয়েছে। এই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় রেকটিফায়েড স্পিরিট যাতে ইথাইল অ্যালকোহল থাকে শতকরা ৯৫·৫৭ ভাগ। এটি তাড়াতাড়ি স্থানীয় জায়গাটিকে সম্পূর্ণ শুকনো করে দেয়—এর ফলে ব্যাকটেরিয়া মারা পড়ে। এটি খেয়ে ফেললে জিভ থেকে পাকস্থলী অব্দি প্রচণ্ড জ্বালা হয় এবং রক্তক্ষরণ হয়ে মারা পড়াও বিচিত্র নয়।

ইনজেকশান দেওয়া, আকুপাংচার করা বা অন্যান্য যে সব ক্ষেত্রে চামড়াকে মোটামুটি জীবাণুমুক্ত করার দরকার হয়, সেখানে অ্যালকোহল (রেক্টিফায়েড স্পিরিট) দেওয়া হয়। চরক সুশ্রুতের আমল থেকেই দুর্বল মানুষকে চাঙ্গা করার উদ্দেশ্যেও এর ব্যবহারের উল্লেখ পাওয়া যায়, তবে এলোমেলোভাবে তা ব্যবহার করলে উপকারের চেয়ে অপকারই ঘটে বেশি। এছাড়া মিথাইল অ্যালকোহল দূষণের চিকিৎসায় এর গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার রয়েছে।

প্রতিগ্রাম অ্যালকোহল শরীরে হজম হয়ে ৭ কিলোক্যালরি শক্তি দেয়। তুলনামূলকভাবে, চর্বিজাতীয় খাদ্যের প্রতিগ্রাম থেকে পাওয়া যায় ৯ কিলোক্যালরি, কার্বোহাইড্রেট থেকে ৪ কিলোক্যালরি ও প্রোটিন জাতীয় খাদ্য থেকে ৪·৫ কিলোক্যালরি।

পানীয় হিসেবে বিভিন্ন ঘনত্বের ইথাইল অ্যালকোহলের বিভিন্ন নাম রয়েছে। যেমন—

সিডার—তৈরি হয় আপেল থেকে—অ্যালকোহল থাকে শতকরা ১-২ ভাগ।

বীয়ার—তৈরি হয় বার্লি থেকে—অ্যালকোহল থাকে শতকরা তিন

থেকে ৬ ভাগ। কোন কোন কোম্পানি একে বাড়িয়ে ৮ ভাগও করছেন। বীয়ার-এ হপ্‌স ও গ্লিসারিন মেশান থাকে, ফলে অ্যালকোহল জনিত জ্বালাভাব হয় না, কিন্তু একটু তেতো লাগে।

ওয়াইন—তৈরি হয় আঙ্গুর থেকে—অ্যালকোহল থাকে শতকরা ৮-১০ ভাগ। অনেক সময় এতে অতিরিক্ত অ্যালকোহল মিশিয়ে তাকে ফর্টিফায়েড বা জোরালো করা হয়।

শ্যামপেন—তৈরী হয় আঙ্গুর থেকে—এ্যালকোহল থাকে শতকরা ১০-১৫ ভাগ।

পোর্ট, শেরি—তৈরী হয় আঙুর থেকে—অ্যালকোহল থাকে শতকরা ১৫-২০ ভাগ।

এসবগুলিই তৈরি হয় অপাতিত বা আনডিস্টিল্‌ড্‌ পদ্ধতিতে। এভাবে প্রস্তুত মদে কিছু পরিমাণ ভিটামিন বি-কমপ্লেক্স ও প্রোটিন থাকে। একই পদ্ধতিতে তৈরি হয় তাড়ি, পচুই, বাংলা, ধেনো, হাঁড়িয়া ইত্যাদি। ভাত, আলু, বার্লি, ওটস, মহুয়া প্রভৃতি সেদ্ধ করে দু'চারদিন জারিয়ে এসব বানানো হয়; কখনো বা বানানো হয় তাল বা খেজুরের রস পচিয়ে।

এছাড়া ডিস্টিল্‌ড্‌ পদ্ধতিতে অর্থাৎ পাতন বা চোলাই করে আরো নানা ধরনের মদ বানানো হয়। যেমন হুইস্কি, রাম, জিন, ব্রাণ্ডি, ভডকা ইত্যাদি—এসবে এ্যালকোহল থাকে শতকরা ৩৫ থেকে ৪৫ ভাগ।

রাম তৈরি হয় গুড় থেকে, ব্রাণ্ডি—আঙ্গুর থেকে, হুইস্কি—বার্লি থেকে, জিন—ভুট্টা থেকে ইত্যাদি।

রাশিয়ায় মদের প্রচলিত নাম ভদকা বা ভোদকা। চীনের সর্বাধিক পরিচিত মদের নাম মাওতাই। (এছাড়া ফেনচিউ, উলিয়ানকিয়ে, ইয়ানথাই রেড ওয়াইন, শাচেং হোয়াইট ওয়াইন, শাওশিং রাইস ওয়াইন, লংইয়ান চেংকাং ওয়াইন, ছিংতাও বীয়ার ইতাাদি নামে চীনে মদ পাওয়া যায়।)

সব মদের মূল উৎসই কার্বোহাইড্রেট বা শ্বেতসার জাতীয় খাদ্যদ্রব্য। কার্বোহাইড্রেটই রাসায়নিক বিক্রিয়ায় ইথাইল অ্যালকোহল বা মদে পরিণত হয়। এই বিক্রিয়াকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে মেশান হয় ঈষ্ট (yeast) নামের ছত্রাক; এতে থাকে জাইমেজ নামক উৎসেচক যা রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটতে সাহায্য করে। চাল, আলু, ভুট্টা ইত্যাদি স্টার্চযুক্ত নানা শ্বেতসার জাতীয় পদার্থকে সামান্য সেদ্ধ করে এতে মল্ট অর্থাৎ অংকুরিত বার্লি

মেশান হয়। মল্টের উৎসেচক ডায়াস্টেজ স্টার্চকে মল্টে রূপান্তরিত করে।

$$2(C_6H_{10}O_5)n \text{ (স্টার্চ)} + n(H_2O) \text{ (জল)} \xrightarrow{\text{ডায়াস্টেজ}} nC_{12}H_{22}O_{11} \text{ (মল্ট)}$$

এরপর এতে মেশান হয় ঈষ্ট। ঈষ্টের উৎসেচক মল্টেজ প্রথমে মল্টকে সরল শর্করা অণুতে রূপান্তরিত করে।

$$C_{12}H_{22}O_{11} \text{ (মল্ট)} + H_2O \text{ (জল)} \xrightarrow{\text{মল্টেজ}} 2C_6H_{12}O_6 \text{ (শর্করা)}$$

এই শর্করা অণু ঈষ্টের আরেক উৎসেচক জাইমেজ-এর দ্বারা ইথাইল অ্যালকোহল তথা মদে রূপান্তরিত হয়।

$$C_6H_{12}O_6 \text{ (শর্করা)} \xrightarrow{\text{জাইমেজ}} 2C_2H_5OH \text{ (ইথাইল অ্যালকোহল)}$$
$$+ 2CO_2 \text{ (কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস)।}$$

এইভাবে ইথাইল অ্যালকোহলের যে জলীয় দ্রবণ পাওয়া যায় তাতে ইথাইল অ্যালকোহলের পরিমাণ শতকরা ১৫ ভাগের বেশি হতে পারে না, কারণ এর বেশি হলেই ঈষ্ট (ছত্রাক) মারা পড়ে। এভাবে গেঁজিয়ে অ্যালকোহল বানানোর পদ্ধতিকে বলা হয় কোহল সন্ধান (fermentation)। এর পর পাতন অর্থাৎ চোলাই করে বেশি ঘনত্বের মদ তৈরি করা হয় এবং পাতনের মাত্রা কমিয়ে বাড়িয়ে ইথাইল অ্যালকোহলের ঘনত্ব কমানো-বাড়ানো যায়।

পাতন বা চোলাই না-করা মদে যে উপকারী ভিটামিন ও প্রোটিন থাকে তার উৎস এই ঈষ্ট। এ মদে অ্যালকোহলের মাত্রাও কিছু কম। কিন্তু এর অর্থ এ নয় যে, এগুলি আদৌ ক্ষতিকর নয়, আসল অ্যালকোহল তো থাকছেই। বীয়ার, ওয়াইন—এ ধরনের মদ পাতন না করে বানানো হয়; কিন্তু আমাদের দেশে এসব যা পাওয়া যায় তা প্রায়ই কৃত্রিমভাবে তৈরি ও আনুপাতিকভাবে জল মিশিয়ে বানানো—ঈষ্ট মেশানো হয় না। তাই এতে প্রোটিন-ভিটামিন থাকে না। আর চোলাই করলে তো ভিটামিনগুলি নষ্টই হয়ে যায়।

এই নানা ধরনের মদ নানা নামে বিভিন্ন দেশে পাওয়া যায়। বিভিন্ন কোম্পানী সামান্য কিছু হেরফের ঘটিয়ে এগুলি বিক্রি করে। ভারতে হুইস্কি পাওয়া যায় প্রায় ২০০টি নামে, রাম-এর ক্ষেত্রে এ সংখ্যা ৫০, ব্র্যাণ্ডির ক্ষেত্রে ৩০, জিন-এর ১০, ওয়াইন-এর ১৫ আর বীয়ার-এর ৫০। এছাড়া রয়েছে কয়েক শ' ধরনের ও নামের দেশী মদ।

যে নামের যে মদই খাওয়া হোক না কেন সর্বক্ষেত্রেই পেটে যাচ্ছে ইথাইল অ্যালকোহল।

মদ ছাড়া তথাকথিত টনিক ও ওষুধ নামে প্রচলিত নানা পদার্থেও ইথাইল অ্যালকোহল মেশান থাকে। এর মাত্রা প্রায়শঃই বীয়ারের থেকেও অনেক বেশি যেমন শতকরা ১১-১২ ভাগ পর্যন্ত। সরকারীভাবে অবশ্য এই মাত্রা ১০ ভাগের মধ্যে রাখার নির্দেশ আছে। টনিক প্রকৃতপক্ষে এক ধরনের সান্ত্বনাদায়ী পদার্থ (placebo)—এর আসল কোন কাজ নেই। তবে অ্যালকোহলের দরুন সাময়িক কিছু ভাললাগার অনুভূতি ঘটায়। একই ঘটনা ঘটে বাচ্চাদের জন্য গ্রাইপ ওয়াটারে থাকা মদের কারণেও। আসক্ত ব্যক্তি মদ ছাড়ার সময়ে এই ধরনের টনিক খেলেও, টনিকের ঐ অল্প পরিমাণ অ্যালকোহলই বিপদের কারণ হয়ে ওঠে।

সুরাসক্তের সুরাসক্তি

চিকিৎসাক্ষেত্রে মদ বা ইথাইল অ্যালকোহলের ব্যবহার অতি নগণ্য। যে সামান্য কিছু ব্যবহার তা আগেই কিছু বলা হয়েছে। তবু মদ নিয়ে সব চিকিৎসাবিজ্ঞানের বইতেই গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, কারণ উপকারী না হলেও শরীরে ও সমাজে এর ক্ষতিকর প্রভাবের ফলে যে অসুস্থতার সৃষ্টি হয় তার বিচার করতেই হয়। সেই প্রাচীন কাল থেকেই এর ব্যবহার চলে আসছে, এর বিপদের সম্ভাবনার কথাও অজানা নয়—তবু এর ব্যবহার কমেনি, কমেনি তার কারণে সমস্যাগুলিও। এই বিপদ ঘটে মানসিক ভাবে, চিকিৎসাগত দিক থেকে এবং সামাজিক ভাবে।

মানসিক সমস্যার বড় একটি দিক হচ্ছে, কেন একজন মানুষ বিপদের সম্ভাবনা জানা সত্ত্বেও অতিরিক্ত মদ খায়—বরং বলা ভাল মদ ছাড়তে পারে না বা মদ না খেয়ে থাকতে পারে না, যার ফলে তার নিজের ও পরিবারের বিপদ ডেকে আনে অর্থাৎ মদের নেশায় ভোগে।

চিকিৎসাগত দিকের মধ্যে স্বাভাবিক ভাবেই ঐ সমস্ত রোগ পড়ে যা মদের অপব্যবহারের ফলে সৃস্টি হয়। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব জনিত এ ধরনের রোগের তালিকা বেশ বড়ই—যা পরে প্রাসঙ্গিক ভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

সামাজিক সমস্যায় রয়েছে বিশেষ এক মানুষের মদ্যপান কিভাবে তার পরিবার, পরিবেশ, কর্মক্ষেত্র ও সমাজকে কলুষিত করে; অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে সূক্ষ্ম বিচারবুদ্ধির হ্রাস ও মূল্যবোধের অবক্ষয় কিভাবে নানা সামাজিক বিকৃতি ও অসুস্থতার সৃস্টি করে।

এবং এ সবগুলি সমস্যাই পরস্পর পরস্পরের সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্ক যুক্ত। সুরাসক্তির ফলে দুর্ঘটনা যেমন ঘটে, উৎপাদন যেমন কমে, অপরাধ যেমন বাড়ে তেমনি শরীর ও পরিবারে ভাঙনও ধরে।

ক্ষতিকর পরিমাণে মদ খেয়ে শরীরে বিষক্রিয়া ঘটে। একে অ্যালকোহলিজম (alcoholism) বলা হয়। এর সঠিক বাংলা প্রতিশব্দ করা মুস্কিল; সুরাসক্তি, আসবাসক্তি, মদ্যাসক্তি, মদ্য-নির্ভরতা এর কাছাকাছি শব্দ হতে পারে। মদের নেশা কথাটিও গ্রহণ করা ষায় এবং বিশেষ ব্যক্তি এভাবে আক্রান্ত হলে তাঁকে সুরাসক্ত (alcoholic) নামে অভিহিত করা যায়। যে

মদ খায় সে-ই সুরাসক্ত নয়। সুরাসক্তি এক ধরনের রোগ এবং সুরাসক্ত একজন অসুস্থ ব্যক্তি। বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থার হিসাব অনুযায়ী সুরাপানে অভ্যস্ত দশজনের মধ্যে একজন সুরাসক্ত হয়ে ওঠেই।

সুরাসক্তি (alcoholism)-এর সংজ্ঞা হিসেবে বলা যায়, এটি একটি দীর্ঘস্থায়ী রোগ (chronic disease) এবং সাথে থাকে আচরণগত অস্বাভাবিকত্ব ; এর ফলে কোন বিশেষ সমাজে বা গোষ্ঠীতে মদ্যপানের যে স্বাভাবিক চিত্র থাকে তাকে ছাড়িয়ে ঐ বিশেষ ব্যক্তি মদ্যপান করতে থাকে এবং একই সাথে সেটি তার স্বাস্থ্য, অন্যের সঙ্গে তার সম্পর্ক বা জীবিকা অর্জনের ক্ষেত্রে বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়। সুরাপায়ী ব্যক্তি সুরাসক্ত রোগীতে পরিণত হচ্ছে কিনা তার প্রাথমিক লক্ষণ কিছু দেখা দেয়, যেমন নেশা হওয়ার জন্য ক্রমশঃই বেশি পরিমাণে মদ খাওয়ার প্রয়োজন হওয়া, তাড়াতাড়ি গেলাস খালি করার প্রবণতা, মাঝে মাঝে সম্পূর্ণ স্মৃতি লোপ এবং মদের প্রতি অপ্রতিরোধ্য আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি। পূর্বোক্ত সংজ্ঞার মধ্যে 'বিশেষ সমাজে বা গোষ্ঠীতে মদ্যপানের স্বাভাবিক চিত্র'কে ছাড়িয়ে যাওয়ার ব্যাপারটি লক্ষণীয়। শীতপ্রধান দেশে বা পাশ্চাত্যের নানা অঞ্চলে নিয়ন্ত্রিত মদ্যপান স্বাভাবিক জীবন যাত্রার একটি অংশ এবং মদ স্বাভাবিক খাদ্যের একটি অঙ্গ হিসাবে স্বীকৃত। তাই ঐ উদাহরণ দেখিয়ে কেউ যদি আমাদের দেশেও মদ্যপানকে অস্বাভাবিক কিছু নয় বলে ব্যাখ্যা করেন তবে স্পষ্টতঃই তাকে সুরাসক্তিকে প্রশ্রয় দেওয়ার পরোক্ষ কৌশল বলেই গণ্য করা উচিত। কারণ আমাদের এখানে মদ খাওয়া স্বাভাবিক সামাজিক কোন ছবি নয়। এর অর্থ আবার এ নয় যে, এক আধবার নিয়ন্ত্রিত ভাবে কেউ মদ্যপান করলেই সে উচ্ছন্নে গেছে বা তার প্রতি অবজ্ঞাসূচক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করতে হবে—যেমন প্রায়শঃ ঘটে আমাদের দেশে, বিশেষত মধ্যবিত্তদের মধ্যে। অন্যদিকে আমাদের দেশের অনেক আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যেই, যেমন সাঁওতালদের মধ্যে হাঁড়িয়া ইত্যাদি খাওয়া প্রায় স্বাভাবিক বলেই গণ্য হয়। তবু পাশ্চাত্যেই হোক বা আমাদের দেশের গরীবদের মধ্যেই হোক—সবার ক্ষেত্রেই অনিয়ন্ত্রিত মদ্যপান একই সামাজিক-শারীরিক বিপদ ডেকে আনে। অর্থাৎ মদের নেশা বা সুরাসক্তির কুফল সর্বত্রই প্রায় এক।

সুরাসক্ত হওয়ার পেছনে বহুবিধ কারণ রয়েছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ হচ্ছে কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্রে এর প্রভাবের দরুন কিছু আপাত ভাল লাগার

অনুভূতি। বিশেষ একজন মানুষ নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ ও সংযম না রাখতে পেরে এই আপাত সুখানুভূতির পেছনে ধাওয়া করে। একই সাথে মদ খেয়ে দুঃখযন্ত্রণা, হতাশা ইত্যাদি সাময়িক ভাবে ভুলে থাকার মিথ্যে আশার ব্যাপারটিও থাকে—যদিও প্রকৃতপক্ষে মস্তিষ্কে মদের প্রভাব চলে গেলে এই হতাশা, এই দুঃখবোধ, এই বিচ্ছিন্নতাবোধ প্রকটতর ভাবে দেখা দেয়—চক্রবৃদ্ধিহারে চলতে থাকে মদ্যপান। একসময় মানসিক ও শারীরিক ভাবেই বিশেষব্যক্তি মদের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে; তখন মদ্যপান বন্ধ করলেই শুরু হয় ভিন্নতর উপসর্গ (withdrawal syndrome)। বিশেষভাবে এর চিকিৎসা না করলে এ ক্ষেত্রে মদ্যপান বন্ধ করা তথা মদের নেশা দূর করা দুরূহ।

বিশেষ পরিবেশে ও সামাজিক পরিস্থিতিতেও মদ্যপান চলতে থাকে বা বাড়তে থাকে। এমনিতে হয়তো মদ না খেলেও চলে যেত, কিন্তু যেই বিশেষ কিছু বন্ধু বান্ধবদের সাথে দেখা হল অমনি চাড়া দিল মদ খাওয়ার ইচ্ছে। কালীপূজা, বিশ্বকর্মাপূজা, দোল বা মহাষ্টমীর দিন পূজা উপলক্ষে হয়তো শুরু হল অস্বাভাবিক মাত্রায় কারণবারি পান। একজন খুব সাদাসিধে মানুষ হয়তো চাকুরি সূত্রে উচ্চপদে উঠল; কোনদিন মদ খায় নি সে। কিন্তু পাশ্চাত্যের অনুকরণে সৃষ্টি হওয়া উচ্চপদমর্যাদার মূল্যবোধ অনুযায়ী তথা আভিজাত্যবোধের প্রকাশ হিসাবে নানা ককটেল পার্টি ইত্যাদির মাধ্যমে সে হয়ে উঠল মদ্যপ। বিখ্যাত কবি-সাহিত্যিক কৃত্রিমভাবে আরোপিত হতাশাবোধ থেকে কিংবা নিছকই পাশ্চাত্যের কিছু কবি-সাহিত্যিকের নির্বোধ অনুকরণে হয়ে উঠলেন বিখ্যাত নেশাখোর। আভিজাত্য সম্পর্কে অসুস্থ ধারণার বশবর্তী হয়েও তথাকথিত অভিজাত অনেকে মদ্যপানকে স্বাভাবিক জীবনযাত্রার অঙ্গ করে তোলেন জোর করে। অল্প আয়াসে, নিজের যোগ্যতার অতিরিক্ত অর্থোপার্জন হলেও কেউ বা এ টাকা ওড়ানোর অন্যতম উপায় হিসেবে মদ্যপানের মত এবং এর আনুষঙ্গিক নানা উচ্ছৃঙ্খল কিছু মাধ্যম বেছে নেয়। আলস্য বা খরচ করার মত অঢেল সময় হাতে থাকা, সুস্থতর উপায়ে সময় ব্যয় করার মানসিকতা নষ্ট হওয়া এবং মূল্যবোধের অবক্ষয়—এ সব মিলিয়েও কেউ এক সময় সুরাসক্তিতে ভুগতে থাকে।

এছাড়া সুরা-আসক্তির অন্যতম কারণ হিসেবে সম্প্রতি বংশাণুগত

(genetic) কিছু দিককেও চাঞ্চল্যকরভাবে আবিষ্কার করা গেছে। যমজ শিশু দু'ধরনের হয়। একটিতে মা-এর একটি ডিম্বাণু ও বাবার একটি শুক্রাণু নিষিক্ত হওয়ার পর দ্বিধাবিভক্ত হয় এবং দু'টি শিশুর জন্ম হয়। এরা হয় ছেলে বা মেয়ে হবে এবং চেহারা ও অন্যান্য বহুদিক থেকেই প্রায় হুবহু এক (monozygotic twin বা identical twin)। আরেক ধরনে মা-এর দু'টি ডিম্বাণু ও বাবা-র দু'টি শুক্রাণু আলাদা ভাবে নিষিক্ত হয়ে যমজের সৃষ্টি করে ; এ দু'টি শিশুর একটি ছেলে, অন্যটি মেয়ে হতে পারে অথবা ঘটনাচক্রে দুটিই ছেলে বা দুটিই মেয়ে হতে পারে—তবে তাদের চেহারা ও অন্যান্য শারীরিক বৈশিষ্ট্যে অনেক অমিল থাকে (dizygotic twin বা fraternal twin)। দেখা গেছে প্রথমোক্তদের ক্ষেত্রে, সুরাসক্তির সম্ভাবনা শতকরা ৫৫ ভাগ বা তারও বেশি এবং দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে, (এদের মধ্যেও শুধুমাত্র বাচ্চা দুটি যদি ছেলে বা মেয়ে হয় তবেই) সে সম্ভাবনা শতকরা মাত্র ২৮ ভাগ। অন্যদিকে বাবা-মা সুরাসক্ত হলে তাদের সন্তানের সুরাসক্ত হওয়ার সম্ভাবনা, সুরাসক্ত নয় এমন বাবা-মা-এর সন্তানদের তুলনায় ৪-৫ গুণ বেশি। অবশ্য উভয় ক্ষেত্রেই বাবা-মা-এর কোন একজনের সুরাসক্তি বাড়লে সেটি সন্তানের সুরাসক্ত হওয়ার সম্ভাবনায় কোন প্রভাব বিস্তার করে না। আর বাবা-মা-এর সুরাসক্তির কারণে সন্তানদের সুরাপায়ী বা সুরাসক্ত হওয়ার প্রবল সম্ভাবনার পেছনে বংশাণুগত কারণ ছাড়াও থাকে বাবা-মার সাথে সন্তানের অস্বাভাবিক সম্পর্ক ও তার জন্য সন্তানের হতাশা, বিচ্ছিন্নতা, মূল্যবোধের অবক্ষয় ইত্যাদি ; পাশাপাশি বাবা-মাকে অনুকরণ করার প্রবণতাও সৃষ্টি হয়।

সব মিলিয়ে সুরাসক্ত (alcoholic) হওয়ার কারণগুলি এই রকম—

(১) মানসিক—হতাশা, বিচ্ছিন্নতাবোধ ইত্যাদি এবং মানসিকভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়া।

(২) শারীরিক—ভাল লাগার অনুভূতি ; কিছুদিন মদ খাওয়ার পর বন্ধ করলে শারীরিক কষ্ট।

(৩) সামাজিক—বিশেষ সামাজিক অবস্থানের কারণে, সঙ্গ, অনায়াস অর্থ, উদ্বৃত্ত সময়, বিলাসী উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাত্রা, তথাকথিত আভিজাত্য ইত্যাদি।

(৪) সাংস্কৃতিক—বিশেষ সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল ও মূল্যবোধের কারণে।

(৫) বংশাণুগত—শক্তিশালী কারণ না হলেও বিশেষ ক্ষেত্রে কিছু ভূমিকা থাকেই।

মদ-হজম প্রক্রিয়া

মদ বা ইথাইল অ্যালকোহল খাওয়ার পর সেটি অপরিবর্তিত ভাবে পাকস্থলী ও ক্ষুদ্রান্ত্র থেকে দ্রুত শোষিত হয়ে রক্তে মেশে ; তবে ক্ষুদ্রান্ত্রেই সেটি ঘটে সবচেয়ে বেশি। মদ খাওয়ার পাঁচ মিনিটের মধ্যেই রক্তে এর উপস্থিতি ধরা পড়ে এবং আধঘণ্টা থেকে দেড় ঘণ্টার মধ্যে রক্তে তার সর্ব্বোচ্চ মাত্রা চলে আসে। তবে মদে শতকরা ২০ ভাগের বেশি ইথাইল অ্যালকোহল থাকলে তার শোষণ হার কমে যায়, কারণ উচ্চমাত্রার অ্যালকোহল পাকস্থলীর সংকোচন-প্রসারণের হার কমিয়ে দেয় এবং পাকস্থলীর ঠিক শেষের অংশটি (pyloric sphincter) এর ফলে সংকুচিত হয়ে থাকে —এসব কারণে পাকস্থলী থেকে ক্ষুদ্রান্ত্রে অ্যালকোহল পৌঁছতেও দেরি হয়। আবার পাতলা মদ, যেমন বীয়ার, অনেক বেশি পরিমাণে খেলেও তার শোষণ হার কমে যায়, অনেক বেশি পরিমাণ জলীয় অংশ থাকার কারণে। অন্যদিকে মদের সাথে দুধ বা অন্য কোন চর্বি জাতীয় পদার্থ (যেমন ঘি, মাখন ইত্যাদি) খেলেও মদের শোষণ হার কমে। (সোম-রসের সাথে দুধ মিশিয়ে খাওয়ার ব্যাপারটি এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যায়।) তবে নিছক চর্বির কারণে এটি ঘটে বলে মনে হয় না, কারণ অলিভ তেল ও ষাঁড়-ভেড়া ইত্যাদির মূত্রথলির চার পাশের চর্বি (suet) খুব একটা প্রভাব ফেলে না। শর্করা অর্থাৎ কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্যও এ্যালকোহলের শোষণ হার কমায়। এ সমস্ত ক্ষেত্রেই বেশ ধীরে ধীরে নেশা জমে—অবশ্য এই ধীর গতিতে নেশা জমার কারণে কেউ আবার আরো বেশি পরিমাণে মদ খেয়ে বিপদ ডেকে আনতে পারে। পাকস্থলীর অস্ত্রোপচার (Billroth I and II gastrectomies) হয়েছে এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে মদ আবার খুব দ্রুত শোষিত হয়, কারণ এসব ক্ষেত্রে অ্যালকোহল খুব দ্রুত ক্ষুদ্রান্ত্রে চলে আসে ; এদের ক্ষেত্রে রক্তে মদের সর্বোচ্চ মাত্রাও, অস্ত্রোপচার না হওয়া ব্যক্তিদের তুলনায় বেশ বেশি ও বেশ দ্রুত ঘটে। যারা নিয়মিত মদ খায় তাদের ক্ষেত্রেও এর শোষণহার বেশি, হজমও হয় তাড়াতাড়ি।

পরিপাকঅন্ত্র থেকে শোষিত হয়ে এই অ্যালকোহল সারা শরীরেই ছড়িয়ে পড়ে। যায় ফুসফুসের মধ্যেকার হাওয়াতে (alveolar air),

প্রস্রাবে এবং মস্তিষ্ক ও মস্তিষ্ক আবরণীর মধ্যকার তরল অংশ (spinal fluid)-এও ; এসবে অ্যালকোহলের মাত্রা রক্তে অ্যালকোহলের পরিমাণের সমানুপাতিকহারে বাড়ে-কমে। শরীরের সব অংশে এই অ্যালকোহল ছড়ালেও শরীরের নানাস্থানে জমে থাকা চর্বির মধ্যে এর অনুপ্রবেশ ঘটে বেশ ধীরে ধীরে। এই কারণে মহিলাদের রক্তে তুলনামূলকভাবে অ্যালকোহলের মাত্রা বেশি থাকে, যেহেতু তাদের শরীরে চর্বির পরিমাণ বেশি। এবং এই ভাবেই পুরুষ মদ্যপের তুলনায় মহিলা মদ্যপের শারীরিক বিপদের সম্ভাবনা বেশি—যদি উভয়েই একই পরিমাণ মদ খায়। অধিকাংশ মহিলাই সাধারণভাবে এত বেশি মদ না খেয়ে ব্যাপারটাকে সামাল দেন সহজাত কারণেই। এ কারণেই হয়তো তাঁদের মধ্যে মদ্যপানের প্রবণতাও কম—যদিও এর সাথে অবশ্যই পারিবারিক, ও সামাজিক সংস্কার, বিধিনিষেধও মিশেথাকে। মদ খাওয়ার সাথে খাবার খেলে তাড়াতাড়ি মদ হজম হয়ে যায় অর্থাৎ খুব দ্রুত রক্ত থেকে দূর হয়। একারণে খালিপেটে বা স্বল্প আহারের সাথে যারা মদ খায় তাদের মধ্যে তুলনামূলকভাবে শারীরিক বিপদ ও মাতাল হওয়ার ব্যাপারটা ঘটে বেশি। এ ব্যাপারটি ঠিক কিভাবে ঘটে তা সম্পূর্ণ পরিষ্কার নয়।

মস্তিষ্কে মদের প্রভাব তথা মাতাল হওয়ার ব্যাপারটা এবং যকৃৎ ও শরীরের অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গে অ্যালকোহলের প্রতিক্রিয়া সরাসরি নির্ভর করে কতক্ষণ ধরে কত মাত্রার অ্যালকোহল রক্তে মিশে আছে তার ওপর। স্পষ্টতঃই রক্তে অ্যালকোহলের মাত্রা বহুভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় যেমন ঃ—কে খাচ্ছে—পুরুষ না নারী, কত পরিমাণে খাওয়া হচ্ছে, কতক্ষণ ধরে খাওয়া হচ্ছে, কড়া না পাতলা খাওয়া হচ্ছে, খালিপেটে খাওয়া হচ্ছে কিনা, সাথে কি খাবার খাওয়া হয়েছে, যে খাচ্ছে সে নিয়মিত খায় কিনা বা তার পাকস্থলীর অস্ত্রোপচার হয়েছে কিনা ইত্যাদি ইত্যাদি।

সারা শরীরে ছড়িয়ে যাওয়ার পর মোট অ্যালকোহলের শতকরা ১০ ভাগ ঘাম, শ্বাস-প্রশ্বাস ও প্রস্রাবের সাথে বেরিয়ে যায়। তাই কেউ মদ খেয়েছে কিনা বা খেলে তার শরীরে মদের মাত্রা কেমন আছে তা বোঝার জন্য রক্ত পরীক্ষা না করেই সহজতর উপায়েরজন্য প্রস্রাব, নিঃশ্বাসের বাতাস ইত্যাদি পরীক্ষা করা হয়। আদালতে পরীক্ষার স্বার্থে (যেমন মদ খেয়ে গাড়ি চালিয়ে, মারামারি বা খুন করে অভিযুক্ত হলে ইত্যাদি) এ পদ্ধতির আশ্রয় নেওয়া হয়।

অল্প পরিমাণ মদ খেলে রক্তে তার মাত্রা খুব একটা বাড়ে না, খুব তাড়াতাড়ি হজমও হয়ে যায়, ফলে ততটা বিপদ হয় না। একটা নির্দিষ্ট মাত্রা পর্যন্ত রক্তে অ্যালকোহলের পরিমাণ বাড়লে তার হজমও বাড়ে ও আরো তাড়াতাড়ি তা রক্ত থেকে দূর হতে থাকে (first order pharmacokinetics)। কিন্তু যদি অতিরিক্ত খাওয়া হয় বা খেয়ে যেতে থাকাই হয় তবে যেই এক সময় প্রতি ১০০ ঘন সেণ্টিমিটার রক্তে অ্যালকোহলের মাত্রা ১০ মিলিগ্রাম পেরিয়ে যায়, তখন শরীরের যে সব উৎসেচক অ্যালকোহলের বিপাকীয় ক্রিয়ায় ভূমিকা নেয় তাদের ক্ষমতার চূড়ান্ত অবস্থায় পেঁছে যায়। ফলে তার পরে, রক্তে অ্যালকোহলের ক্রমবর্ধমান মাত্রার সাথে তাল মিলিয়ে অ্যালকোহলের বিপাকপ্রক্রিয়া তথা রক্ত থেকে তার দূরীকরণের হার বাড়ে না। এর ফলে বিপদ ক্রমশঃ বেড়ে চলে। ঐ সময় প্রতি ঘণ্টায় বড় জোর ১০-১৫ ঘন সেণ্টিমিটার অ্যালকোহল (বা শরীরের প্রতি কিলোগ্রাম ওজনে ১৫০ মি. গ্রা. অ্যালকোহল বা ৯০-প্রুফ হুইস্কির এক আউন্স বা ১০-১২ আউন্স বীয়ার) রক্ত থেকে দূর হতে থাকে, রক্তে এ্যালকোহলের মাত্রা যাই হোক না কেন (zero order pharmacokinetics)। অ্যালকোহল বা কোন ওষুধ শরীরে যে হারে বিপাক হয়ে দূর হয় তাকে প্রকাশ করার অন্যতম প্রতিশব্দ হচ্ছে রক্তে বা প্লাজমায় তার অর্ধজীবন (half life বা $t_{\frac{1}{2}}$)—অর্থাৎ যে সময়ে তার ঘনত্ব অর্ধেক কমে। রক্তে অ্যালকোহলের মাত্রা পূর্বোক্ত (১০ মিঃ গ্রা / ১০০ ঘন সে. মি.) মাত্রার বেশি হলে এই অর্ধজীবন বেড়ে চলে। এ অবস্থা বিশেষ ব্যক্তির পক্ষে অতি ভয়াবহ পরিণাম ডেকে আনে। (এ সম্পর্কে পরবর্তী অংশে আরো কিছু আলোচনা করা হয়েছে।)

অ্যালকোহলের বিপাকক্রিয়া মূলত ঘটে যকৃতে (liver-এ)। অ্যালকোহল সমৃদ্ধ রক্ত যকৃতের মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় যকৃতের বেশ কিছু উৎসেচক অ্যালকোহলকে জারিত করে এ্যাসিট্যালডিহাইডে পরিণত করে। এক্ষেত্রে যকৃতের কোষের সাইটোপ্লাজম অংশে থাকা অ্যালকোহল ডিহাইড্রোজিনেজ উৎসেচকটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে এবং এটি সহায়ক হিসেবে কাজে লাগায় আরেকটি রাসায়নিক পদার্থকে—নিকোটিনামাইড এ্যাডেনিন ডাইনিউক্লিওটাইড। কোষের মাইটোকনড্রিয়ায় থাকা ক্যাটালেজ নামক উৎসেচকও অ্যালকোহল-জারণে ভূমিকা নেয়। ভূমিকা নেয় এণ্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের মাইক্রোজোমে থাকা মাইক্রোসোমাল ইথানল অক্সিডাইজিং

সিস্টেম (MEOS)-ও। তবে সাধারণ ক্ষেত্রে এই শেষোক্ত প্রক্রিয়াটি খুব একটা ভূমিকা নেয় না ; যারা নিয়মিত মদ খায় যথাসম্ভব তাদের ক্ষেত্রেই এটি সক্রিয়।

এইভাবে যে এ্যাসিট্যালডিহাইড তৈরি হয় সেটি যকৃতের কোষের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর এবং মদ্যদূষণের (alcohol intoxication-এর) ক্ষেত্রে এটির ভূমিকাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। যকৃতকোষের মাইটোকণ্ড্রিয়ায় থাকা এ্যাসিট্যালডিহাইড ডিহাইড্রোজিনেজ নামের উৎসেচকের দ্বারা এবং নিকোটিনামাইড এ্যাডেনিন ডাইনিউক্লিওটাইডের সহযোগিতায় এই এ্যাসিট্যালডিহাইড এ্যাসিটাইড কোএনজাইম-এ ও এ্যাসিটেটে পরিণত হয়—এই এ্যাসিটেট পরবর্তী ধাপে রূপান্তরিত হয় কার্বন ডাই অক্সাইড ও জল-এ। এইভাবেই অ্যালকোহলের বিপাকক্রিয়া শেষ হয়। এই বিপাকের প্রক্রিয়াতেই প্রতি গ্রাম অ্যালকোহল ৭ কিলো ক্যালরি শক্তি দেয় ; অবশ্য এ শক্তি না দিলেও কোন ক্ষতি ছিল না, কিন্তু সাথে যে এ্যাসিটালডিহাইড তৈরী করে তা শারীরিক ক্ষতিসাধন করে। আর অ্যালকোহলের কোন পুষ্টি ক্ষমতাও নেই। অনেকের ধারণা এই শক্তি পাওয়ার জন্য অ্যালকোহল খাওয়া যায়। এটি অত্যন্ত বিপজ্জনক একটি ধারণা—যা মদ্যপানকে উৎসাহিত করে। প্রকৃতপক্ষে অ্যালকোহলের এ শক্তি অত্যাবশ্যক কিছু নয়। অন্যান্য খাবার থেকে শক্তি যথেষ্টই পাওয়া যায়। মাঝখান থেকে মদ খেয়ে আনুষঙ্গিক বিপদ ডেকে আনা হয়। (অনেকের এও ধারণা আছে যে, অ্যালকোহল শেষ অবধি বিপাকীয়-ক্রিয়ায় কার্বোহাইড্রেট জাতীয় পদার্থে পরিণত হয় এবং সেটিই শক্তির জোগান দেয়। এটি সম্পূর্ণ ভুল একটি ধারণা।)

তবে আমাদের শরীরের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া এমনই যে তা আপ্রাণ চেষ্টা করে মদ্যপকে বাঁচাতে। মদ বা ইথাইল অ্যালকোহল যে হারে জারিত হয়ে এ্যাসিট্যালডিহাইডে পরিণত হয়, তার থেকে অনেক বেশি দ্রুত তালে এ্যাসিট্যালডিহাইড জারিত হয়। অত্যন্ত ক্ষতিকর এ্যাসিট্যালডিহাইডের মাত্রা রক্তে যাতে বিপজ্জনকভাবে না বেড়ে যায় তার আপ্রাণ চেষ্টা চলে এইভাবে এবং এইভাবে প্রাকৃতিক বিবর্তনে মানুষ (বা প্রাণী) আত্মরক্ষার যে স্বাভাবিক ক্ষমতা অর্জন করেছে তাতে মদ্যপকেও বাঁচানোর চেষ্টা করে শরীরতাত্ত্বিক ক্ষমতাবলী। তবু বারবার ব্যাপারটি ঘটতে থাকলে, প্রকৃতির শত শুভ ইচ্ছা সত্ত্বেও কেউ যদি অতিরিক্ত মদ খেয়ে নিজের আত্মরক্ষার

প্রক্রিয়াকেই আত্মঘাতীভাবে আঘাত করতে থাকে তবে তার ফল ফলেই—শুরু হয় মদ্যদূষণ।

সুরাসক্ত ব্যক্তিদের নেশা ছাড়ানোর জন্য ডাইসালফিরাম নামক ওষুধ (এ্যাণ্টাবিউজ নামে পাওয়া যায়) অনেক সময় ব্যবহার করা হয়। এটি এ্যাসিট্যালডিহাইডের দ্রুত জারণে বাধা দেয় এবং এইভাবে রক্তে এ্যাসিট্যাল-ডিহাইডের মাত্রা বাড়ায়। এটি ও মদ একসাথে খেলে, রক্তে এ্যাসিট্যাল-ডিহাইডের উচ্চমাত্রার জন্য বমি, বমিবমি ভাব, রক্তচাপ কমে গিয়ে মাথা ঘুরিয়ে যাওয়া ইত্যাদি ঘটে। এইভাবে সুরাসক্ত ব্যক্তিটির মদের প্রতি আগ্রহ কমানোর চেষ্টা করা হয়। আমাশার ওষুধ মেট্রোনিডাজোল (ফ্লাজিল, ক্লণ্ট, মেট্রোজিল ইত্যাদি বাণিজ্যিক নামে পাওয়া যায়) ও ফুরাজলিডোন (ফুরোক্সান, ডিপেণ্ডাল, ডিসফার প্লাস ইত্যাদিতে থাকে), ডায়াবিটিস (মেলাইটাস)-এর ওষুধ সালফোনীল ইউরিয়া (র‍্যাস্টিনন, ডায়াবিনিজ, ড্যাওনিল ইত্যাদি বাণিজ্যিক নামে পাওয়া যায়)—এগুলিও একইভাবে এ্যাসিট্যালডিহাইডের এ্যাসিটেটে রূপান্তর মন্থর করে দিয়ে রক্তে এ্যাসিট্যাল-ডিহাইডের মাত্রা বাড়ায় তথা আনুষঙ্গিক শারীরিক অসুবিধার সৃষ্টি করে। তাই এই সব ওষুধ খাওয়াকালীন মদ খেলেও একই ধরনের কষ্ট দেখা দিতে পারে।

———

সুরা ও শরীর

মাথার চুল থেকে পায়ের নখ—শরীরের প্রতিটি অংশই সুরার প্রভাবে প্রভাবিত হয়। সবচেয়ে বেশি যেগুলিতে আঘাত পড়ে সেগুলি এখানে আলোচনা করা হল। তবে স্পষ্টতঃই সবার উপর এর প্রতিক্রিয়া শুরু হয় কমবেশি এক সাথেই। আবার সবগুলি লক্ষণ বা কষ্টই একসাথে দেখা দেয় না। কতক্ষণ বা কতদিন ধরে কত পরিমাণ মদ খাওয়া হচ্ছে তার ওপর এসব নির্ভর করে। বিভিন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন ধরনের লক্ষণ বা রোগেরও সৃষ্টি হতে পারে।

মস্তিষ্ক ও নার্ভতন্ত্র

অ্যালকোহলের তাৎক্ষণিক প্রভাব সবচেয়ে বেশি পড়ে মস্তিষ্ক তথা কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্রে। মস্তিষ্কই আমাদের ঐচ্ছিক-অনৈচ্ছিক সমস্ত কাজ-কর্মের মূল নিয়ন্ত্রক। তাই শরীরের প্রায় সব ধরনের কাজই কম বেশি বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। আমাদের মন তথা চিন্তা করার ক্ষমতা, ব্যক্তিত্ব, সৃজনশীলতা, মূল্যবোধ ও নৈতিকতা, ও নানা মানবিক গুণাবলী, মস্তিষ্কের কাজেরই ফল। সুরার প্রভাবে এসবগুলিই প্রভাবিত হয়।

সামান্য পরিমাণের অ্যালকোহল খেলে তা আমাদের মস্তিষ্ক কাণ্ডের (brain stem-এর) রেটিকুলার ফর্মেশানের জাগরণ প্রক্রিয়া (arousal mechanism)-কে প্রভাবিত করে। তবে একটু বেশি মাত্রাতেই মস্তিষ্কের কর্টেক্স অংশ সরাসরি নিস্তেজিত হয়। এবং তাই প্রকৃতপক্ষে প্রচলিত ধারনা অনুযায়ী অ্যালকোহল উত্তেজক কোন নেশা নয়, মস্তিষ্কের উপর এর প্রভাব **নিস্তেজক** (depressant) হিসেবে—অজ্ঞান করার অন্যান্য নানা রাসায়নিকের মত। মদ খেয়ে অনেকে হাত-পা ছোঁড়ে, বেশি কথা বলে অর্থাৎ যেন কাজ বেশি করে। স্বাভাবিক অবস্থায় এসব অস্বাভাবিক কাণ্ডকারখানাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য মস্তিষ্কের যে প্রভাব থাকে সেগুলি কমে যাওয়ার জন্যই আসলে এসব ঘটে। মূলতঃ এই কারণেই মদ খাইয়ে কাউকে দিয়ে অনেক অস্বাভাবিক কাজ যেমন খুন করা, ফাঁসি দেওয়া কিংবা কোন অপরাধ করানো সম্ভব হয়। ধর্ষণ করা বা এ জাতীয় অমানবিক ক্রিয়াকলাপও কেউ করতে পারে। ন্যায় অন্যায় বোধ,

সুস্থ মূল্যবোধ ও বিচার বিবেচনার ক্ষমতা—এসব কমে যায় বলেই মদের ঘোরে এসব করা যায়, যা সুস্থ অবস্থায় করতে বা হয়তো ভাবতেও পারে না ঐ ব্যক্তি। অন্যদিকে ভীতি, সংকোচ, দ্বিধা—এ ধরনের জড়তাও মদ খেলে অনেক সময় চলে যায়। তাই মদ খেয়ে অনেক অভিনেতা দুর্ধর্ষ অভিনয় করতে পারেন কিংবা শল্য চিকিৎসক দক্ষভাবে অস্ত্রোপচার করতে পারেন। কিন্তু স্পষ্টতঃ এসবে মদ্যজনিত শারীরিক ক্ষতি হয় একই রকম এবং এ ধরনের অভ্যাস সুস্থ কোন ব্যাপার নয়।

মদ খেয়ে **পরিশ্রমও** করা যায় বেশি। এর অর্থ এ নয় যে, মদের কারণে কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। আসলে মস্তিষ্কে মদের প্রভাবের কারণে, ক্লান্তিবোধ কমে যায় বলেই শারীরিক শ্রম করা যায়। কিন্তু আসলে এটি শরীরের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। ক্লান্তিবোধ আমাদের শরীরের পক্ষে উপকারী একটি প্রক্রিয়া। একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত কাজ করার পর এই ক্লান্তিবোধের কারণেই শরীরকে বিশ্রাম দেওয়ার প্রয়োজন হয়। তা না হলে শরীর ভাঙতে থাকে। একইভাবে মদ যৌনক্ষমতা বাড়ায় বলে যে ধারণা রয়েছে, তাও ভুল। মদের ঘোরে কেউ অশ্লীল কথা বলা ও অঙ্গ ভঙ্গি করা, যৌন উদ্দীপক ভাবভঙ্গি ইত্যাদি করতে পারে—কারণ এক্ষেত্রেও স্বাভাবিক শালীনতাবোধ চলে যায়। কিন্তু **যৌন ক্রিয়াকলাপ** মদের কারণে বাধাপ্রাপ্তই হয়—স্বাভাবিকভাবে যৌন মিলন করা সম্ভব হয় না। এমন কি সুরাসক্ত পুরুষের আংশিক ধ্বজভঙ্গও হয় (partial erectile impotence)। এ ব্যাপারে সেক্সপীয়ারের ম্যাকবেথে সুন্দর মন্তব্যটি স্মরণ করা যায়,—অ্যালকোহল "provokes the desire but takes away the performance." একইভাবে সুরাসক্ত মহিলারও যৌন ক্ষমতা ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যায়; যৌন উত্তেজনা, উৎসাহ এসবও কমে যায়।

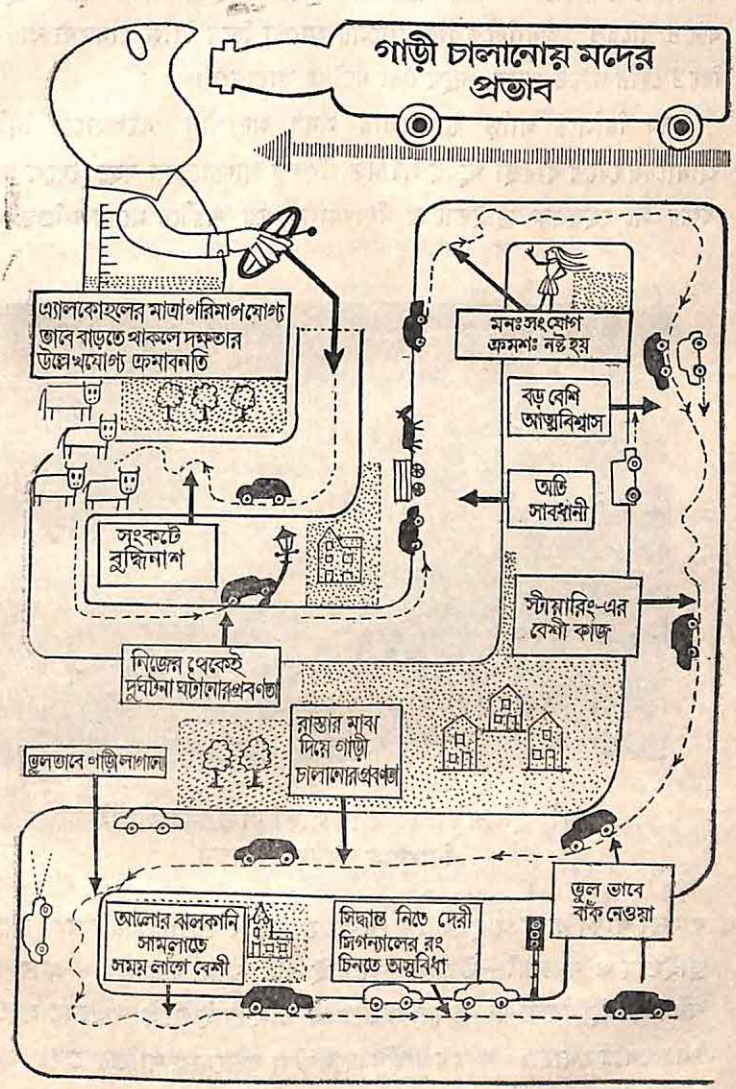
নিরাপদে **গাড়ি চালানোর** জন্য চালকের শারীরিক-মানসিক সুস্থতা খুবই দরকার। চালকের উপর মদের প্রভাবে বিশেষতঃ বিচার-বিবেচনার ক্ষমতা কমে যাওয়ার কারণে মোটর দুর্ঘটনা প্রায়ই ঘটে। এ ব্যাপারে পাশ্চাত্যের অনেক দেশে কঠোর আইন করা হয়েছে—কারণ ওসব দেশে মদ্যপায়ী ও গাড়িওয়ালা লোক—উভয়ের সংখ্যাই যথেষ্ট। এ নিয়ে বেশ কিছু গবেষণাও চালানো হয়েছে, তবে এ গবেষণার কিছু অসুবিধাও ছিল। কারণ গাড়ির চালককে আগে থেকে জানিয়ে তার উপর পর্যবেক্ষণ করলে,

সে আগে থেকেই সতর্ক হয়ে যায়—ফলে সঠিক পর্যবেক্ষণ সম্ভব হয় না। তবু এটি স্পষ্টভাবে জানা গেছে যে, সামান্য পরিমাণ মদ্যপানও কোন না কোনভাবে গাড়ি চালানোর উপর প্রভাব ফেলে।

ম্যাঞ্চেস্টারের বাস ড্রাইভারেরা নিরাপত্তার জন্য পুরস্কার পায়। কিন্তু এদের মত অভিজ্ঞ ও দক্ষ ড্রাইভারদের মধ্যেও, অ্যালকোহলের এমন কোন সর্বনিম্ন নিরাপদ মাত্রা বের করানো যায় নি, যে মাত্রার নীচে এটি সুনিশ্চিতভাবে বলা যায় যে গাড়ি চালানোর ক্ষেত্রে ড্রাইভারদের বিচার-বিবেচনার ক্ষমতা আদৌ কমে না। এটিও প্রমাণিত যে, মদ্যপানের ফলে দক্ষতা কমে যাওয়ার ফলে দুর্ঘটনা ঘটার চেয়ে বিচার-বিবেচনার ক্ষমতা কমে যাওয়াই প্রধান কারণ। এছাড়া যারা কম পরিমাণ মদ খেয়েছে তারাও যে হারে দুর্ঘটনা ঘটায়, প্রচুর মদ খেয়ে গাড়ি চালালেও দুর্ঘটনার হার প্রায় একই। আরেকটি সমীক্ষায় দেখা গেছে, চটপটে-স্মার্ট লোকেরা (extrovert) মদ খেয়েও তাকে খুব একটা পাত্তা দেয় না, ফলে গাড়ির স্পীডও কমায় না এবং ভুল করে বেশি। অন্যদিকে লাজুক, চুপচাপ ব্যক্তিরা (introvert) মদ খেয়ে সতর্ক হয়ে যায়, গাড়ির স্পীডও কমিয়ে দেয়, আর সবসময় প্রমাণ করার চেষ্টা করে যে, তার কিছু হয় নি। সে বেশ ভালভাবেই গাড়ি চালাতে পারে ; এসবের ফলে সে ভুল একটু কম করে বটে কিন্তু বেশি স্টীয়ারিং চালানো, ঘন ঘন স্পীড পাল্টানো এসবের ফলে গণ্ডগোল কিছু করেই। আরো দেখা গেছে তরুণ ও যুবারা মদ খেয়ে গাড়ি চালালে তারা দুর্ঘটনা ঘটায় অনেক বেশি ; উঠতি বয়সীরা (adolescent) আরো বেশি। অন্যদিকে মদ খেয়ে গাড়ি চালিয়ে দুর্ঘটনা ঘটার পরে মাথায় আঘাত লাগলে মদের কারণে ব্যাপারটি সামাল দেওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে ; ফলে দুর্ঘটনায় পড়া সুস্থ ড্রাইভারদের চেয়ে মাতাল ড্রাইভারদের মধ্যে মৃত্যুহারও অনেক বেশি।

মদ্যপানের ফলে ব্যক্তিত্ব ও মানসিকতার সার্বিক অস্বাভাবিকত্বের মত গাড়ি চালানোর সব ক্ষেত্রেই গণ্ডগোল হয়। গাড়ির সামনে হঠাৎ কিছু এসে গেলে (যেমন, লোকজন, গরু বাছুর ইত্যাদি) সে বিপদ কাটাতে অসুবিধে হয়। আবার নিজের থেকেই দুর্ঘটনা ঘটানোর প্রবণতারও সৃষ্টি হয় ; হঠাৎ হয়তো গিয়ে পাশের দোকানে বা ল্যাম্পপোষ্টে ধাক্কা মারল গাড়ি। সামান্য কারণে মনোযোগ নষ্ট হয়। রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে

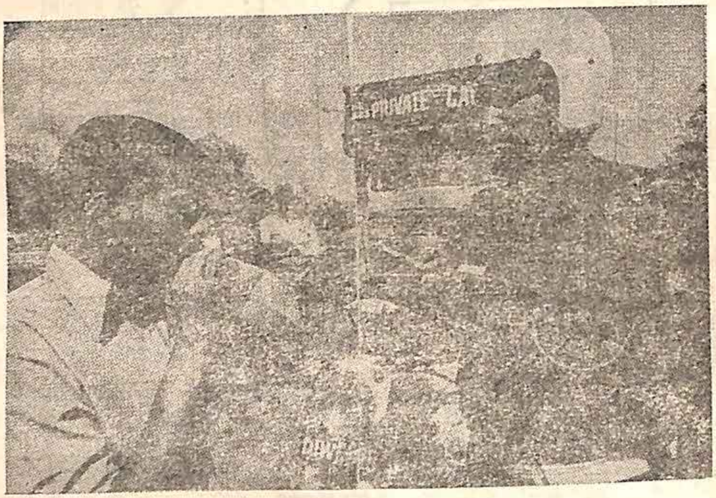
থাকা কোন মহিলা দেখে, জটলা বা হৈ-চৈ-এর আওয়াজ শুনেই গাড়ি হয়তো টালমাটাল হয়ে গেল। কখনো ড্রাইভারের মনে জাগে অতি সতর্কভাব।



একটা গরুর গাড়িকেও পেরিয়ে যাওয়ায় ভয় হয়, পাছে ধাক্কা লেগে যায়। কখনো বা ড্রাইভার হয় বড় বেশি আত্মবিশ্বাসী। জোরে এগিয়ে চলা লরি বা গাড়িকে অনায়াসে পেরিয়ে যেতে চায় এবং প্রায়শঃই দুর্ঘটনা ডেকে

আনে। মোড় ঘোরার সময় সঠিক বিবেচনা করা যায় না, কখনো বা গাড়ি চলে রাস্তার মাঝ দিয়ে। সামনের অন্য গাড়ির আলোর ঝলকে চোখ ধাঁধিয়ে গেলে তাকে সামাল দিতেও দেরি হয়, তাই ঠিক তার পরেও দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। অন্যদিকে সিগন্যালের আলো চিনে গাড়ি থামানো বা স্টার্ট দিতে দেরি ঘটতে পারে, দুর্ঘটনা ঘটে এ কারণেও।

সব মিলিয়ে গাড়ি চালানোর সময় মদ্যপান একেবারে নিষিদ্ধ। আমাদের দেশে ব্যবস্থা খুবই সীমিত, কিন্তু পাশ্চাত্যের বহু দেশে রাস্তার ধারে সন্দেহজনক ড্রাইভারের নিঃশ্বাস ধরে শরীরে মদের অস্তিত্ব মাপার



দিল্লী পুলিশ রাস্তার ধারে গাড়ী দাঁড় করিয়ে ড্রাইভারের নিঃশ্বাস পরীক্ষা করছেন

ব্যবস্থা থাকা বাধ্যতামূলক। প্রয়োজনে রক্ত ও প্রস্রাব পরীক্ষাও করা হয়। ড্রাইভার ও পথচারী—উভয়ের স্বার্থেই এটি করা দরকার। এসব ব্যবস্থা যখন চালু ছিল না তখন অনেক মাতাল ড্রাইভারই আইনের হাত থেকে পার পেয়ে গেছে। কারণ এমনি দুর্ঘটনা ঘটানোর শাস্তির চেয়ে, মদ খেয়ে গাড়ি চালিয়ে দুর্ঘটনা ঘটানোর শাস্তি অনেক বেশি। ভাল পরিমাণ মদ খেয়েও অনেক ড্রাইভার বাহ্যিক আচার-আচরণে বেশ স্বাভাবিক থাকে, ফলে নিঃশ্বাস-রক্ত-প্রস্রাব ইত্যাদি পরীক্ষা না করলে, সে যে মদ খেয়েছিল তা

প্রমাণ করা মুশকিল হয়। সবচেয়ে বড় কথা এ ধরনের দুর্ঘটনার সংখ্যা অল্প পরিমাণ মদ খেয়ে যারা গাড়ি চালায় তাদের মধ্যেই বেশি—তাদের বাইরের আচার আচরণে প্রায় কোন গণ্ডগোলই ধরা যায় না। যেমন একজন বেশ ভাল পরিমাণ মদ খেয়ে গাড়ি চালিয়ে দুর্ঘটনা ঘটায় আর পুলিসের হাতে ধরা পড়ে। কিন্তু লোকটি মদ খাওয়ার ব্যাপারটা সম্পূর্ণ অস্বীকার করে। পুলিসের ডাক্তারকে সে জিজ্ঞেস করে, "মদ খেলে কি কেউ সোজা হয়ে দাঁড়াতে, ঠিকভাবে লাফাতে, ডিগবাজি খেয়ে ঠিকভাবে পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়তে পারে ?" ডাক্তার বল্লেন, "অবশ্যই না।" তখন লোকটি ঐ সবগুলিই স্বাভাবিকভাবেই করে দেখায় এবং ছাড় পেয়ে যায় ; কিন্তু দুর্ঘটনার ঠিক আগেই আরেক ডাক্তার তাকে প্রচুর মদ খেতে দেখেছিলেন। এ ধরনের ব্যাপার আগে প্রায়ই ঘটত। রাস্তার ধারে নিঃশ্বাস-রক্ত-প্রস্রাবের পরীক্ষা বাধ্যতামূলক করার ফলে এ ধরনের ব্যাপার অনেক কমে গেছে।

রক্তে কত পরিমাণ অ্যালকোহল থাকলে তবু গাড়ি চালানো যেতে পারে অথবা আইনের চোখে নিরপরাধ হতে পারে তার পরিমাণ বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকম। ব্রিটেনে এটির পরিমাণ ১০০ ঘন সেণ্টিমিটার (সি. সি. বা মিলিলিটার বা মি. লি.) রক্তে ৮০ মিলিগ্রাম অ্যালকোহল (০·০৮%)। আমেরিকার বিভিন্ন প্রদেশে এ মাত্রা ৮০ থেকে ১৫০ মিলিগ্রাম। অষ্ট্রেলিয়াতে ১৫০ মিলিগ্রাম ইত্যাদি।

আরো দেখা গেছে মদ্যপানের পরের দিন সকালে যখন রক্তে হয়তো অ্যালকোহল নেই, কিন্তু 'হ্যাংওভার' থাকে, তখন গাড়ি চালানোও কিছু বিপদের সৃষ্টি করতে পারে, একইভাবে। এটি যথাসম্ভব ক্লান্তি, উত্তেজনা-প্রবণতা, এসবের জন্য ঘটে। সবশেষে মাতাল হয়ে গাড়ি চালানো ছাড়া, গাড়ি চালানোর সময় মাতাল পথচারীদের প্রতিও সতর্ক থাকা উচিত।

মদ নার্ভতন্ত্রকে তথা আমাদের বোধবুদ্ধি, চিন্তাভাবনা, ব্যক্তিত্ব-মানসিকতা সবকিছুকেই ধ্বংস করতে থাকে। মস্তিষ্কের ক্ষেত্রে মদ্যপান জনিত অসুস্থতার বহিঃপ্রকাশ অজস্র ও নানা ধরনের। সব ক্ষেত্রেই মূল কারণ অতি মাত্রায় মদ্যপান, কিন্তু বিশেষ অবস্থা সৃষ্টির প্রক্রিয়া বিভিন্ন রকমের হতে পারে। এই কারণে মদ্যপানজনিত নার্ভতন্ত্রের অসুস্থতা-গুলিকে এভাবে ভাগ করা যেতে পারে—

(১) মদ্যদূষণ (alcoholic intoxications)

(২) মদ্যপানে অভ্যস্ত ব্যক্তি সাময়িকভাবে মদ্যপান সম্পূর্ণ বন্ধ করলে বা বেশ কমিয়ে দিলে তার কারণে অসুস্থতা (abstinence বা withdrawal syndrome)

(৩) মদের পরোক্ষ প্রতিক্রিয়ায় মস্তিষ্ক ও নার্ভের রোগ—এটি বিভিন্ন ধরনের হতে পারে যেমন Wernicke-Korsakoff Psychosis, Polyneuropathy, Cerebellar degeneration, optic-neuropathy, Pellagra.

(৪) মদ্যপানের সাথে যুক্ত কিন্তু বিভিন্নভাবে সৃষ্টি হওয়া অসুস্থতা

(৫) যকৃতের সিরোসিস জনিত নার্ভের রোগ

পরপর উপরোক্ত অবস্থাগুলি সম্পর্কে কিছু বিস্তারিত আলোচনা করা হল।

(১) **মদ্যদূষণ**—মদের প্রভাবে কি সব লক্ষণ দেখা দেয় তা মোটামুটি সবারই জানা, বিশেষত যাঁরা মদ্যপায়ী দেখার সুযোগ পান বা পেয়েছেন। তবে মদ খাওয়ার পরিমাণের উপর এগুলি বিভিন্ন ধরনের হয়। আপাত উত্তেজনা ও উল্লাস, আচার-আচরণ ও বিচার-বিবেচনার গণ্ডগোল, কথা জড়িয়ে যাওয়া আর বাচালতা, অসংলগ্ন কথাবার্তা ও অসংলগ্ন হাঁটাচলা, বিরক্তিভাব থেকে শুরু করে ঘুমঘুম ভাব বা ঘুম ও গভীর অজ্ঞান অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে।

তবে বিরল কারো কারোর ক্ষেত্রে—সাধারণতঃ যে নিয়মিত মদ খায় না, তার ক্ষেত্রে, হঠাৎ অল্প পরিমাণ মদ খাওয়ার পরই অতিমাত্রায় উত্তেজিত অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে। প্রচন্ড ক্রোধ, হাত পা ছোঁড়াছুঁড়ি, জিনিসপত্র ছুঁড়ে দেওয়া ও ভেঙে ফেলা, আক্রমণমুখী মনোভাব ও উগ্র কাজকর্ম দেখা দিতে পারে। আসলে এসব আচরণ স্বাভাবিক বিচারবিবেচনা ও সুস্থ আচরণ সম্পর্কে বোধগুলি অবদমিত হওয়ার কারণেই ঘটে। তারপর সে নিজে থেকেই ঘুমিয়ে পড়ে অথবা ঘুমের ওষুধ দিয়ে তাকে ঘুম পাড়াতে হয়। ঘুম ভাঙার পর নিজের ঐসব আচরণ সম্পর্কে তার কোন স্মৃতিই থাকে না। (এ ধরনের অবস্থাকে বলা হয় pathological intoxication) অ্যালকোহলের প্রতি বিশেষ ব্যক্তির বিশেষ সংবেদনশীলতা, মাথায় আগের কোন আঘাত, অথবা চাপা থাকা মৃগীরোগ—এ ধরনের নানা কারণই এই অবস্থার পেছনে থাকে বলে মনে করা হয়। অনেক সময় ঘুমের জন্য

বার্বিচুরেট ওষুধ দিলে এ ধরনের আপাতবিরোধি প্রতিক্রিয়া (paradoxic reaction) দেখা যায়। তবে ব্যাপারটিকে বিশেষ ধরনের মৃগী (temporal lobe epilepsy) ও একজন সোসিওপ্যাথ (সমাজবিরোধী ?)-এর আচমকা এ ধরনের হঠাৎ উগ্র আচরণ থেকে আলাদা করা দরকার।

অনেক সুরাপায়ী মত্ত অবস্থায় ব্ল্যাক আউটের কথা বলে—যে সময়কার স্মৃতি পরে তার একেবারেই লোপ পায়। এ সময়, অন্তত অন্যের চোখে, সে যে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল তা নয়। ব্যাপারটি মদের মাত্রার উপরও ততটা নির্ভর করে না।

এ সব ক্ষেত্রেই অ্যালকোহল সার্বিক অবেদক (general anaesthetic) হিসেবে নার্ভকোষের উপর কাজ করে (alcoholic narcosis)। কত পরিমাণ অ্যালকোহল একজনকে অজ্ঞান করে দিতে পারে এবং কত পরিমাণই বা মস্তিষ্কের শ্বাসপ্রশ্বাসের কেন্দ্রকে সম্পূর্ণ অবদমিত করে মৃত্যু ডেকে আনতে পারে তার সীমারেখা অতি সূক্ষ্ম। অনেক সময়ই মদের কারণে জ্ঞানহীন অবস্থা ও অন্য কিছু কারণে অজ্ঞান হওয়া—এই দুটিকে আলাদাভাবে বোঝা মুশকিল হয় না—এক্ষেত্রে মদ খাওয়ার ইতিহাসই রোগনির্ণয়ের বড় হাতিয়ার। তবু মত্ত অবস্থায় দুর্ঘটনা বা অন্য কোন কারণে মাথায় আঘাত অথবা সম্পূর্ণ অন্য কোন কারণে জ্ঞানহীন অবস্থা হয়েছে কিনা তার বিচার করা রোগীর জীবনের স্বার্থে অত্যন্ত জরুরী—কারণ তা প্রায়ই প্রাণঘাতী হয়, তাই যথোপযুক্ত চিকিৎসা অতি দ্রুত শুরু করা দরকার।

মদ খেয়ে যেতে থাকলে রক্তে অ্যালকোহলের মাত্রা ক্রমশঃ বাড়তে থাকে, আর ঐ অনুযায়ী পরপর দেখা দেয় আনুষঙ্গিক অসুবিধাগুলি। রক্তে অ্যালকোহলের মাত্রা যখন ০·০২% তখন থেকেই শরীরটা গরম গরম লাগে। বন্ধু-বন্ধু ভাবও হয়। সবাইকে মনে হয় সুহৃদ,—যেচে কোলাকুলি বা উদার ব্যবহার করতে ইচ্ছে করে। পাশাপাশি চোখে দেখার ক্ষেত্রেও—কোন জিনিস দেখে তার প্রতি প্রতিক্রিয়ার সময়ও বাড়ে।

০·০৪% হলে জোরে গাড়ি চালানো বা এ ধরনের দ্রুতগতি সম্পন্ন কাজ করতে অসুবিধে হয়।

০·০৬% হলে উৎকণ্ঠাবোধ চলে যায়, মনটা ভাল লাগে (উড়ুউড়ু ভাব)। কিন্তু পাশাপাশি কাজের দক্ষতা আরো কমে যায়। বিশেষতঃ এই অবস্থার জন্যই একজন মদ্যপানকে দুঃখ ও হতাশা থেকে মুক্তির সাময়িক

উপায় হিসেবে বেছে নেয়। কিন্তু স্পষ্টতঃ এতে দুঃখ বা হতাশার আসল কারণ তো দূর হয়ই না—বরং ক্রমশঃ বাড়তে থাকে।

০.০৯% হলে উগ্র আচরণ শুরু হয়, আবেগগত উগ্রতাও বাড়ে। জোরে জোরে ও বেশি কথা বলা শুরু হয়। অবদমিত ইচ্ছার ও প্রবৃত্তির উপর নিয়ন্ত্রণ চলে যায়; বিকৃত কাজকর্ম-অঙ্গভঙ্গি-কথাবার্তা চলতে থাকে। জ্ঞান ও কর্মের পারস্পরিক সম্পর্ক ও ক্ষমতা আরো কমে।

০.১২% হলে কথায় জড়তা আসে, টল-টলায়মান অবস্থা হয়।

০.১৫%—মত্ত অবস্থা।

০.২০%—বমি, হতাশা ও দুঃখ, প্রায় সব কাজে অক্ষমতা।

০.৩০%—ঘুম ঘুম ভাব।

০.৪০%—গভীর ঘুম বা প্রায় জ্ঞানহীন অবস্থা।

০.৬০%—হৃদপিণ্ড ও শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হয়ে মৃত্যু। তবে এ অবস্থায় পেঁছনো খুবই দুরূহ, কারণ তার আগেই বমি হয়ে যায়। আর মদ্যপ ব্যক্তি অজ্ঞানও হয়ে পড়ে, ফলে মদ খাওয়া বন্ধ হয়ে যায়।

তবে বমির জন্যও অনেক মদ্যপের মৃত্যু ঘটে। বমির সাথে বেরিয়ে আসা জিনিসপত্র প্রায় অচেতন ঐ ব্যক্তির শ্বাসনালীতে ঢুকে যায় এবং দম আটকে (suffocation হয়ে) মারা পড়ে সে।

এক ড্রিংক (drink) বলতে সাধারণতঃ এক আউন্স হুইস্কি অথবা ৪% অ্যালকোহল যুক্ত একবোতল অর্থাৎ ১২ আউন্স বীয়ার খাওয়াকে বোঝায়। এক ড্রিংকের পর রক্তে অ্যালকোহলের মাত্রা হয় ০.০২-০.০৩%, ২ ড্রিংকের পর ০.০৫-০.০৬%; ৩ ড্রিংকের পর ০.০৮-০.০৯%; ৪ ড্রিংকের পর ০.১১-০.১২%; ৫ ড্রিংকের পর ০.১৪-০.১৫%; ৭ ড্রিংকের পর ০.২%; ১০ ড্রিংকের পর ০.৩%; ১৪ ড্রিংকের পর ০.৪%; ১৭ ড্রিংকের পর ০.৫%; ২০ ড্রিংকের পর ০.৬% অর্থাৎ মৃত্যু।

মদ্যপানের উপর মানসিকভাবে নির্ভরতার তথা মদ্যপানের স্তর সম্পর্কে ১৯টি অবস্থার কথা অনেকে বলেন।

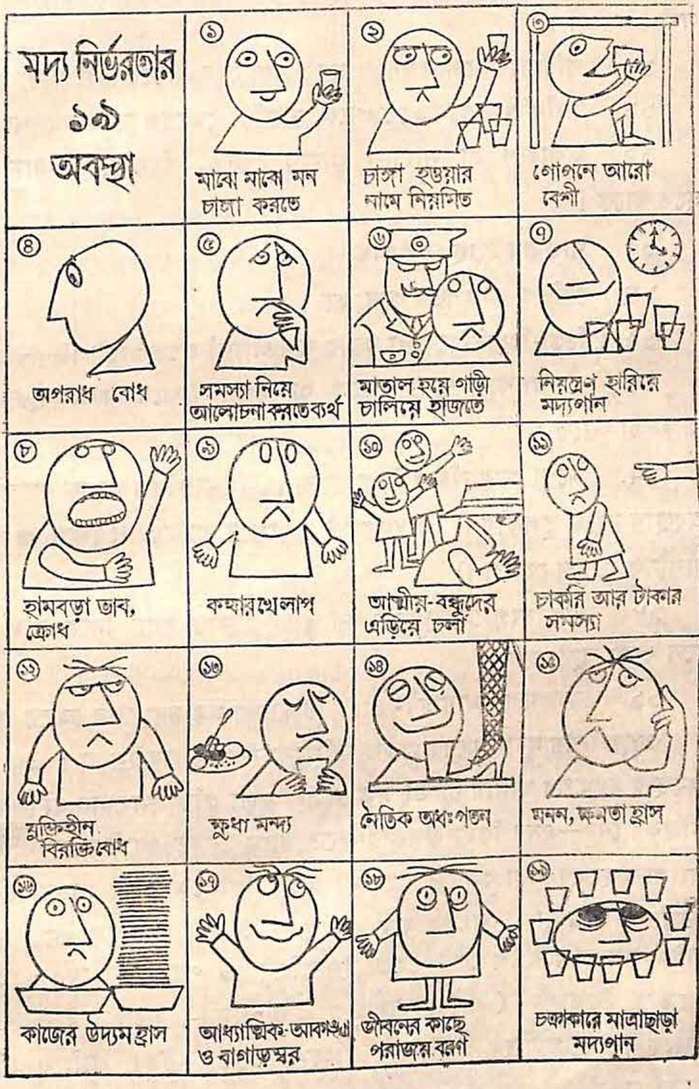
১. মাঝে মাঝে মদ খাওয়া হয়। যেন দুঃখ বা হতাশা ভুলতে বা ক্লান্তি কাটাতেই শুধু খাওয়া হচ্ছে—মনকে এধরনের প্রবোধ দেওয়া চলে।

২. আর মাঝে মাঝে নয়—এই উদ্দেশ্যে নিয়মিতই চলতে থাকে।

৩. গোপনে গোপনে মদ্যপান চলে।

৪. মদ খাওয়ার জন্য অপরাধবোধ জাগে।

৫. কোন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা সম্ভব হয় না।



৬. মত্ত অবস্থায় গাড়ী চালানো বা এ ধরনের কাজের জন্য পুলিসের হাতে ধরা পড়া শুরু হয়।

৭. মদ্যপানের উপর নিয়ন্ত্রণ চলে যায়।

৮. মারমুখী আচরণ, সাথে বাগাড়ম্বর—মুখে রাজাউজির মারা।

৯. কথা দিয়ে কথা রাখা যায় না, পূর্বসিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ করাও সম্ভব হয় না।

১০. পরিবারের লোকজন ও প্রকৃত বন্ধুদের এড়িয়ে চলা শুরু হয়।

১১. আর্থিক অনটন হতে থাকে, চাকরির ক্ষেত্রেও সমস্যা দেখা দেয়।

১২. অকারণে বা সামান্য কারণে ক্ষোভ, বিরক্তি, উষ্মার উদ্রেগ হতে থাকে।

১৩. খাওয়ার ইচ্ছে চলে যায়।

১৪. নৈতিক অধঃপতন শুরু হয়।

১৫. চিন্তা-বিচারবিবেচনা করার ক্ষমতা নষ্ট হতে থাকে।

১৬. বকেয়া কাজ শুরু করতে বা নতুন উদ্যমে কাজ শুরু করতে অক্ষমতা আসে।

১৭. মিথ্যে আধ্যাত্মিক ইচ্ছে জাগে। (তথাকথিত অনেক ধর্মগুরুদের অবস্থার সাথে তুলনীয়। এদের কেউ মদ খেয়ে, বা মদ না খেয়ে এ ধরনের মানসিক রোগে ভোগে।)

১৮. জীবনসংগ্রামে সম্পূর্ণ পরাজয় স্বীকার করে নিয়ে হাল ছেড়ে বসে থাকা শুরু হয়।

১৯. চক্রাকারে, মাত্রাহীনভাবে, উন্মাদের মত মদ্য পান চলতে থাকে।

ওষুধ দিয়ে মদ্যদূষণের প্রকৃত চিকিৎসা করা সম্ভব হয় না। এর বিভিন্ন অবস্থায় মদ্যপের মাথায় ঠাণ্ডা জল ঢালা, কড়া কফি খাওয়ান বা জোর করে কাজকরানো—এসব কিছু উপকার দিতে পারে, কিন্তু এগুলির কোনটিই রক্তে অ্যালকোহলের মাত্রা কমাতে পারে না অর্থাৎ অ্যালকোহলের জারণ প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে না। গভীর ঘুম বা প্রায় অজ্ঞান অবস্থায় তার সাধারণ চিকিৎসার পাশাপাশি কেউ কেউ ইনসুলিন ও গ্লুকোজ দেন; কেউ বা নার্ভের উত্তেজক (এ্যামফিটামাইন, পেণ্টলিন-টেট্রাজল বা মেট্রাজল, ক্যাফিন, পিক্রোটক্সিন ইত্যাদি) ব্যবহার করেন—এসব গুলিও মস্তিকের উত্তেজনা ঘটিয়ে কাজ করে, অ্যালকোহলের জারণ তথা দহন বাড়ায় না। রক্তে অ্যালকোহলের মাত্রা ভয়াবহ অবস্থায় পেঁছিলে রক্তের পরিবর্তন, হিমোডায়ালিসিস-ই রক্তে তার মাত্রা কমাতে পারে।

আর যদি সন্দেহ হয় সাথে ভেজাল হিসেবে মিথাইল অ্যালকোহল

বা ইথিলিন গ্লাইকল-এর মত কোন বিষাক্ত জিনিস শরীরে গেছে তবে হিমোডায়ালিসিস অত্যন্ত জরুরী।

মদ্যদূষণের প্রকৃত চিকিৎসা একটা নির্দিষ্ট মাত্রার আগে মদ্যপান বন্ধ করা। আর প্রতিরোধের জন্য দরকার চিরতরে মদ্যপান বন্ধ করা ও তার জন্য আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা নেওয়া।

(২) মদ্যপান বন্ধ করার কারণে অসুস্থতা—

নিয়মিত মদ্যপান করা তো বিপজ্জনকই কিন্তু নিয়মিত এমনকি কয়েক-দিনধরে ভাল পরিমাণে মদ খেতে খেতে হঠাৎ মদের পরিমাণ খুব কমিয়ে দিলে বা সম্পূর্ণ বন্ধ করলেও নানা রকম কষ্ট দেখা দেয়— মদ্যপানের অভ্যাস বা নেশার এমনই পরিণতি। কেউ মদ ছাড়ার শুভ ইচ্ছায় তা করতে পারে। কারোর ক্ষেত্রে টাকা-পয়সার ঘাটতি, অন্য অসুস্থতা, দুর্ঘটনা, হাসপাতালে ভর্তি হওয়া, শারীরিক দুর্বলতা, নিজের উপর ঘৃণা ইত্যাদি নানা কারণে মদ্যপানে বিরতি ঘটতে পারে। এর কারণে যে সব কষ্ট হয় সেগুলির মূল কারণ মদ্যদূষণ কিন্তু তাদের বহিঃপ্রকাশ ঘটে বিরতি সময়ে।

শরীরের নানা বিপাকীয় ক্রিয়ার উপর অ্যালকোহলের ক্রমবর্দ্ধমান প্রভাবের কারণে যে শারীরিক নির্ভরতা (Physical dependence)-র সৃষ্টি হয়—তার জন্যই এটি ঘটে। (নেশার নানা ড্রাগ, আফিম ইত্যাদির ক্ষেত্রেও এ ব্যাপার ঘটে। অন্যদিকে ধূমপানের নেশা মূলত মানসিক নির্ভরতা বা psychological dependence সৃষ্টি করে। তাই ধূমপান বন্ধ করলে এ ধরনের প্রতিক্রিয়া ঘটেনা)।

সাধারণভাবে এর কষ্টের মধ্যে প্রথম শুরু হয় পুরো শরীরের কাঁপুনি (tremulousness)—সাথে থাকে খিটখিটে বা বদ মেজাজ ও বমি বা বমিভাব। সাধারণতঃ সকালের দিকে এ কষ্ট হয়। কিছুদিন নিয়মিত মদ খেলেই প্রাথমিকভাবে সকালের এ সব কষ্ট শুরু হতে থাকে। আসলে একেত্রে রাত্রের ঘুমের সময়কার সাময়িক বিরতিই এ ধরনের কষ্ট ও লক্ষণের শুরুর কারণ। তখন হয়তো মদ খেয়ে 'শরীরটাকে আবার চাঙ্গা' করা যায়। কিন্তু পরের দিন আবার আরো বেশি করে দেখা দেয়। এইভাবে চলতে চলতে কোন কারণে, মদ্যপান সম্পূর্ণ বন্ধ হলে তীব্রতর কষ্ট শুরু হয়, তীব্রতম হয় ২৪-৩৬ ঘণ্টার মধ্যে।

মুখ-চোখ লাল হয়ে যায়, ক্ষুধা কমে যায়, বমি ও হেঁচকি হতে থাকে;

নাড়ীর গতি হয় দ্রুত। রোগী সহজে চমকে চমকে ওঠে, ঘুম চলে যায়। ভালভাবে কথার উত্তর দেয় না, দিলেও কড়াভাবে বা তাচ্ছিল্যের সঙ্গে—যেন নেহাৎ দায়ে পড়ে। মদ্যপানের সময়কার কয়েকদিনের স্মৃতি কমে যায়, ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন ঘটে। পুরো শরীরের কাঁপুনি হতে থাকে—এমনকি প্রতি সেকেণ্ডে ৬-৮ বার পর্যন্ত। নির্জন, শান্ত পরিবেশে তা কমে, কিন্তু কাজ করতে গেলেই বেড়ে যায়—এমনকি এর ফলে ভাল ভাবে দাঁড়ান, স্পষ্টভাবে কথা বলা বা নিজে নিজে খাওয়াও কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। কারো কারোর ক্ষেত্রে বাইরে থেকে কাঁপুনি বোঝা যায় না, কিন্তু রোগী বুঝতে পারে 'শরীরের ভেতরটা যেন কাঁপছে'।

এ অবস্থাকে কাটানোর জন্য আবার মদ খেলে, তার পরে কোন কারণে আবার মদ্যপান বন্ধ হলে, কষ্টগুলি তীব্রতরভাবে দেখা দেয়। কিন্তু মদ না খেয়ে একটু ধৈর্য্য ধরে থাকলেই কয়েকদিনের মধ্যে কষ্ট চলে যায়। তবে কিছু অসুবিধে থেকেই যায়। অতি সতর্কভাব, সহজে চমকে ওঠা, চলা ফেরার কাঁপুনি লাগা ইত্যাদিও থাকে। এ অবস্থায় ঘুমের ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়াতে হয়। প্রায় দু'সপ্তাহ পরে এ ধরনের ওষুধ ছাড়াই রোগী ঘুমুতে পারে। এ সময়টা হাসপাতালে রেখে চিকিৎসা করাটাই শ্রেয়। তার প্রধান কারণ বাড়ীতে থাকলে রোগী নানা কৌশলে আবার মদ সংগ্রহ করে; হয়তো এমন কষ্টের ভান করতে থাকে যে বাড়ীর লোক সন্ত্রস্ত হয়ে মদ খেতে দিয়ে দেয়।

এ ধরনের রোগীর প্রতি চারজনের একজন অস্বাভাবিক অনুভূতির শিকার হয় (hallucinosis)। রাত্রে দুঃস্বপ্ন হতে থাকে; স্বপ্ন কিংবা পরিচিত কোন জিনিসের ভুল ব্যাখ্যা করার প্রবণতা আসে। ছোট কোন জিনিসকে বিরাট কিছু মনে হওয়া, কোন জিনিসকে কোঁচকানো-বিকৃত আকারে দেখা—এসব ঘটে। (তথাকথিত অনেক ধর্মগুরু বা আধ্যাত্মিক ব্যক্তিদের অস্বাভাবিক মানসিক অনুভূতির মত।)

বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ভ্রমাত্মক শ্রবণানুভূতি (auditory hallucinosis) তীব্র আকারে দেখা দেয় (hallucinatory insanity of drunkards বা alcoholic mania)। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'নিশীথে' গল্পে হয়তো এ ব্যাপারটিকে মাথায় রেখেছিলেন। মৃতা স্ত্রীর শেষ কথা—"ওকে? ওকে গো?" কথাগুলো শুনতে পাওয়ার কথা শোনানোর আগে নায়ককে

তাই ডাক্তার জিজ্ঞাসা করে নিয়েছিলেন মদের মাত্রা বেশি হয়ে গিয়েছিল কিনা ! এই বিশেষ অবস্থায়, স্মৃতি ও অন্যান্য মানসিক দিকগুলি প্রায়ই ঠিক থাকে। মিথ্যে করেই মন্ত্র, গান, গুনগুন আওয়াজ, বন্দুকের গুলি ইত্যাদি যেন শোনা যায় ; কখনো বা দেবতার কোনো আদেশ, মৃত ব্যক্তি বা প্রেতাত্মার গলা, রেডিও, প্রতিবেশী বা বাড়ির কারোর গলার আওয়াজ শুনতে পারে রোগী। রোগীর মনে হয় তাকে উপলক্ষ করেই কথা বলা হচ্ছে। কখনো বা যেন গালাগালি দেওয়া, ভয় দেখানোর মতো মনে হয়, কখনো বা হয়তো ততটা আপত্তিকর নয়। যে ধরনেরই হোক না কেন রোগীর কাছে এসব আওয়াজ অতি স্পষ্ট মনে হয়। এর জন্য সে পুলিসও ডাকতে পারে, কেউ বা ভগবানের গলা শুনতে পাচ্ছে ভেবে অবতার বনে যায়, আবার কেউ হয়তো আত্মরক্ষার জন্য ঘরে লুকিয়ে পড়ে, এমনকি ভয়ে আত্মহত্যাও করে ফেলতে পারে।

প্রথমের দিকে রোগীর মনে এইসব অনুভূতি সম্পর্কে কোন দ্বিধা থাকে না। ক্রমশঃ যখন উন্নতি ঘটে তখন তার মনে এসবের অস্তিত্বে সন্দেহ দেখা দেয়, এবং পরের দিকে এমনও বলে যে ঐ সব শোনার সময় সে হয়তো পাগল হয়ে গেছিল। সম্পূর্ণ সুস্থ হলে, আগের অনুভূতিগুলি যে মিথ্যে ছিল তা স্পষ্ট বুঝতে পারে, কিন্তু সেগুলি প্রায় হুবহু স্মৃতি থেকে উদ্ধার করতে পারে এবং নিজের অস্বাভাবিক মানসিক অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হয়। ধান্দাবাজ কেউ এ অবস্থায় ঈশ্বরের বাণী ইত্যাদি শুনতে পেয়েছিল বলে অন্যের বিশ্বাসযোগ্য ভাবে প্রচার করে আধ্যাত্মিক ব্যবসা চালাতে পারে।

অল্প সংখ্যক রোগীর ক্ষেত্রে আগের মত তীব্র না হলেও, এ ধরনের মিথ্যে অনুভূতির সামান্য লেশ থেকে যেতে পারে। এ অবস্থাটি অনেক সময় সিজোফ্রেনিয়ার সাথে গুলিয়ে যায়। কিন্তু মদ্যপানের ইতিহাস ও তার সাথে এ ধরনের মানসিক অস্বাভাবিকত্বের সম্পর্ক, বাড়িতে বিশেষ কারোর সিজোফ্রেনিয়ার ইতিহাস না থাকা, প্রায় ক্ষেত্রেই পরের দিকে এ ধরনের লক্ষণ ক্রমশ না বেড়ে চলা—এ সব থেকে সিজোফ্রেনিয়ার সাথে এর তফাৎ বোঝা যায়। তবে বারবার ব্যাপারটি ঘটলে অর্থাৎ আবার মদ খাওয়া শুরু করে, কিছুদিন পরে তা বন্ধ করার পরে ঐ অস্বাভাবিক অনুভূতি আবার হলে, সিজোফ্রেনিয়ার মত এসব লক্ষণ স্থায়ী হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে।

বেশ কিছুদিন ধরে মদ খেতে খেতে হঠাৎ আংশিক বা সম্পূর্ণ মদ

খাওয়া বন্ধ করলে মস্তিষ্কের আরেক ধরনের রোগ হয়। এর প্রকাশ ঘটে খিঁচুনির মাধ্যমে (withdrawal seizures বা rum fits)। ১০ জনের মধ্যে ৯ জনের মধ্যেই তা ঘটে মদ বন্ধ করার ৭-৪৮ ঘণ্টার মধ্যে—সর্বাধিক হয় ১৩-২৪ ঘণ্টায়। ঐ সময় মস্তিষ্কের তড়িৎ পরীক্ষায় (Eletroen cephalogram) অস্বাভাবিকত্ব থাকতে পারে—তবে তা কয়েকদিনের মধ্যে ঠিক হয়ে যায়। এ অবস্থায় পুরো শরীরে তীব্র আক্ষেপ বা খিঁচুনি হতে পারে, অথবা কিছুক্ষণ অন্তর অন্তর স্বল্পস্থায়ী খিঁচুনি হতে পারে। এটি মৃগী রোগের সাথে প্রায়ই গুলিয়ে যায়। এক্ষেত্রেও মদ্যপানের সাথে খিঁচুনির সম্পর্ক, মস্তিকের তড়িৎ ক্রিয়া পরবর্তীকালে ঠিক হয়ে যাওয়া—এসব থেকে মৃগীর সঙ্গে এর পার্থক্যের ব্যাপারটি বোঝা যায়। তাছাড়া মৃগীর অনেক রোগীর ক্ষেত্রে তীব্র আলো বা আলো সম্পর্কিত উত্তেজনায় খিঁচুনি শুরু হয় (photic stimulation)। কিন্তু মদ্যপানে বিরতির কারণে যে খিঁচুনি হয় সেটি ঘটে আলোর মাত্রা দ্রুত পরিবর্তনে—ঘন ঘন চোখে আলোর ফ্ল্যাশ ফেললে বা সিনেমার মত ছবির দ্রুত পরিবর্তন ঘটলে (stroboscopic stimulation)। টিভি বা সিনেমা দেখতে বসে তাই এ ধরনের রোগীর খিঁচুনি শুরু হতে পারে।

যাদের আগে থেকেই মৃগী ছিল তাদের ক্ষেত্রে মদ্যপানের প্রতিক্রিয়া আরো বিপজ্জনক। হঠাৎ একদিন পার্টিতে, সপ্তাহ শেষে বা কোন পারিবারিক অনুষ্ঠানে (পাশ্চাত্যের দেশে যা প্রায় ঘটে) কিছু বেশি পরিমাণে মদ খেয়ে ফেললে খিঁচুনি শুরু হয়—বিশেষতঃ যেসব মৃগীর উৎস কোন পুরনো আঘাত অথবা যার কোন আপাত কারণ জানা নেই (ıdiopathic epilepsy)। তবে এক্ষেত্রেও 'মাতাল' অবস্থায় খিঁচুনি হয় না, হয় পরের দিন সকালে, যখন সামান্য ঘোর ভাব থাকে।

মদ্যপানে বিরতির সবচেয়ে ভয়াবহ অবস্থা হল তীব্র মনোবৈকল্য, অনিদ্রা, খিঁচুনি ইত্যাদি। এ অবস্থার নাম ডেলিরিয়াম ট্রেমেন্স (delirium tremens)। এটি পূর্বোক্তগুলির চেয়ে বেশ তীব্র একটি বিশেষ অবস্থা। রোগীর স্বাভাবিক বিচার-বিবেচনা-চিন্তা করার ক্ষমতা অনেক কমে যায়, কিছু বদ্ধমূল মিথ্যে ধারণা (delusion)-এর সৃষ্টি হয়—যেমন কারোর মনে হতে লাগল তার স্ত্রী বা স্বামী বা কোন বন্ধু তাকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলবে, কিংবা স্ত্রী দ্বিচারিণী অথবা কোন ঠাকুর-দেবতা তার সাথে দেখা

করছে ইত্যাদি ইত্যাদি। ভুল বকা, মিথ্যে অনুভূতি (halluicination)-এর ব্যাপারও সাথে থাকে। রোগী ক্রমাগত উল্টোপাল্টা কথা বলে যেতে থাকে, সাথে মিশে থাকে হতাশা ও হতবুদ্ধির ভাব, মুখের ভাব হয় বিরক্ত বা ভয়গ্রস্ত। হাতে পায়ে কাঁপুনি বা মৃদু খিঁচুনি, ক্ষিদে কমে যাওয়া, অস্বাভাবিক ক্রোধ, অনিদ্রা, জ্বর, দুঃস্বপ্ন ও অস্থিরতা, প্রচুর ঘাম, চোখের তারার প্রসারণ, নাড়ীর গতি দ্রুত হওয়া—এসব এ অবস্থার অন্যান্য লক্ষণ। অনেকদিন ধরে কেউ হয়তো মদ খায়; কোন দুর্ঘটনার কারণে বা অস্ত্রোপচারের জন্য হাসপাতালে তাকে ভর্তি করা হলে মদ্যপানে এই সাময়িক বিরতির কারণে হঠাৎই এ ধরনের লক্ষণ শুরু হতে পারে। তবে প্রায়শঃই হঠাৎ যেমন শুরু হয়, তেমনি দু'চারদিন (শতকরা ৮০ ভাগ ক্ষেত্রে ৩ দিন) পর তা হঠাৎই চলে যায়,—রোগী গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। তারপর সে জেগে ওঠে কিছু ক্লান্ত, শান্ত অবস্থা নিয়ে; আগের ঘটনা তার স্মৃতিতে প্রায়ই কিছু থাকে না। কারো-কারোর ক্ষেত্রে এ অবস্থা কাটে ধীরে ধীরে। এবং বিরল ক্ষেত্রে একাধিকবার ব্যাপারটি ঘুরে ঘুরে দেখা দিতে পারে।

এদের মধ্যে শতকরা প্রায় পাঁচজন মারা যায়। এই মৃত্যুর কারণ অতিমাত্রায় জীবাণু সংক্রমণ, শরীরের উচ্চ তাপ, রক্ত সঞ্চালন স্তব্ধ হয়ে যাওয়া ইত্যাদি হতে পারে। কারোর ক্ষেত্রে কোন কারণই বোঝা যায় না এবং মৃত্যু ঘটে অতি আকস্মিকভাবে।

অনেকের ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে কিছুটা মৃদুভাবেও এ অবস্থা (mild delirium tremens) দেখা দিতে পারে। কিছুক্ষণের জন্য মানসিক বৈকল্য, অস্থিরতা হতে পারে, আর কয়েকদিন বা সপ্তাহ ধরে থাকতে পারে কিছু অস্বাভাবিক আচরণ। কারোর ক্ষেত্রে ভ্রান্ত অনুভূতি, মিথ্যে ধারণার ব্যাপারটিই স্পষ্ট করে দেখা দেয়। এর থেকে মৃত্যুর সম্ভাবনা নেই এবং শুধু বিরল ক্ষেত্রে খিঁচুনি হতে পারে।

নিয়মিত মদ্যপানের পর মদ্যপানে বিরতি ঘটলে রক্তে ম্যাগনেসিয়ামের মাত্রা ও রক্তের অম্লত্ব কমে। এ দুটিই নার্ভের অতি উত্তেজনা প্রবণতার সাথে যুক্ত এবং মূলত এ কারণেই ডেলিরিয়াম ট্রেমেন্স ঘটে ও খিঁচুনি হয়। বেশ কিছুদিন ধরে মদ খেলে, মস্তিষ্কের শ্বাসকেন্দ্রের নার্ভকোষগুলি রক্তের কার্বনডাই অক্সাইডের মাত্রার পরিবর্তনের প্রতি তার স্বাভাবিক

৩

সংবেদনশীলতা হারায়—যে সংবেদনশীলতা আত্মরক্ষামূলক প্রক্রিয়ায় শরীরে কার্বন-ডাই অক্সাইডের কম বা বেশি পরিমাণের বিপদ থেকে শ্বাস-প্রশ্বাসের নিয়ন্ত্রণ ঘটিয়ে শরীরকে রক্ষা করে। তাই হঠাৎ মদ বন্ধ হলে এই নার্ভকোষগুলি কার্বন-ডাই অক্সাইডের প্রতি অতিমাত্রায় সংবেদনশীল হয়ে পড়ে, ফলে দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাস চলতে থাকে। তীব্র অবস্থায় এ থেকে হাত পা ঝিন ঝিন করা, মাথায় হাল্কা অনুভূতি এবং এমনকি খিঁচুনি হয়।

সুরাসক্ত ব্যক্তির মদ খাওয়া বন্ধ বা কমানোর কারণে উপরোক্ত যেসব কষ্ট ও লক্ষণ দেখা যায় (withdrawal syndrome) তার চিকিৎসা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই চিকিৎসা ঠিক মত না হলে মদের নেশা ছাড়তে ইচ্ছুক ব্যক্তিও এসব কষ্ট থেকে অব্যাহতি পেতে আবার মদ খাওয়া শুরু করে এবং নেশা আর যায় না—ক্রমবর্ধমান সর্বনাশের পথে সে এগিয়ে যায়।

এ চিকিৎসা হাসপাতালে করাটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ বাইরে সুরাসক্ত ব্যক্তি নানা কৌশলে মদ জোগাড় করে খাওয়া শুরু করে।

মৃদু ডেলিরিয়াম ট্রেমেন্স বা মনোবৈকল্য সাধারণ ঘুমের ওষুধেই ভাল হয়ে যায়। ডায়াজিয়াম (১০ মি. গ্রা.) বা ক্লোরডায়োজেপোক্সাইড (১০-৫০ মি. গ্রা.) ৪-৬ ঘণ্টা অন্তর মুখে খাওয়ানো যায়। অনেকের ধারণা আছে, এ অবস্থায় রোগীকে অল্প পরিমাণে মদ দেওয়া যায় ; প্রকৃতপক্ষে এর পেছনে শুভবুদ্ধি যেমন নেই, তেমনি বিপজ্জনকও বটে। ডেলিরিয়াম ট্রেমেন্স পরিপূর্ণভাবে দেখা দিলে এসব ওষুধ ইনজেকশান করে দেওয়া উচিত। যেমন ক্লোরডায়াজেপোক্সাইড (লিব্রিয়াম) ৫০-১০০ মি. গ্রা. ৪ ঘণ্টা অন্তর (দিনে সর্বাধিক ৩০০ মি. গ্রা.)—যতক্ষণ না অস্থিরতা ইত্যাদি কমছে। ডায়াজিপাম (ভ্যালিয়াম) ৫-১০ মি. গ্রা. আধঘণ্টা থেকে একঘণ্টা অন্তর শিরা দিয়েও ইনজেকশান করে দেওয়া যায়। স্টেরয়েড জাতীয় ওষুধের এক্ষেত্রে কোন ভূমিকা নেই। তবে মনোবৈকল্যের ক্ষেত্রে ফেনোথায়াজিন দেওয়া যায়, অন্যত্র নয়। এছাড়া প্যারালডিহাইড, ক্লোরপ্রোমাজিন, হালোপেরিডল ইত্যাদিও ক্ষেত্র বিশেষে ব্যবহার করা যায়। মদ্যপান বন্ধ করার কারণে লক্ষণ দেখা দেওয়ার শুরুতে ভ্যালিয়াম খেয়ে নিলে বেশি খিঁচুনি (যেমন rum fits) আর হয় না। হলেও এক্ষেত্রে মৃগীর খিঁচুনির ক্ষেত্রে যে সব ওষুধ ব্যবহার করা হয়, সেগুলির প্রায়ই প্রয়োজন হয় না—নিয়মিত ব্যবহারের প্রয়োজন তো নেই-ই। তবে

আগে থেকেই যাদের মৃগী ছিল তাদের ক্ষেত্রে এর ওষুধ অবশ্য চালাতেই হয়।

মনোবৈকল্য, মিথ্যে অনুভূতি, মিথ্যে অন্ধবিশ্বাস—এসবের চিকিৎসার একটি দিক যেমন ভ্যালিয়াম বা লিব্রিয়ামের মত ওষুধ (মুখে খাইয়ে) তেমনি আরেকটি দিক হচ্ছে পরিবেশগত। আত্মীয়-স্বজনের উপস্থিতিতে চিকিৎসা চালানো, চিকিৎসার প্রতিটি খুঁটিনাটি ব্যাপার রোগীকে বুঝিয়ে বলা, বিশ্রাম, মৃদু আলো, বেশি চলাফেরা না করতে দেওয়া, মানসিক সাহস জোগান, বন্ধুত্বপূর্ণ কথাবার্তা বলা ইত্যাদি প্রয়োজন। এ অবস্থায় সে যে রোগী—নিছক মাতাল নয়, তা মাথায় রেখে সহানুভূতির সাথে তাকে বিবেচনা করা উচিত।

চিকিৎসার (withdrawal syndrome-এর) আরেকটি বড় দিক হল, জল, লবণ ও গ্লুকোজ—মুখে খাইয়ে বা শিরা দিয়ে প্রয়োগ করে এসবের জোগান ঠিক রাখা। এসবের সাথে অবশ্যই থায়ামিন (ভিটামিন বি-১) যথেষ্ট পরিমাণে দিতে হবে।

সুরাসক্ত বলে পরিচিত বাড়ির কারোর মদ্যপান বন্ধ হওয়ার পরে এসব লক্ষণ দেখা দিলে বাড়ির লোকেরাই বেশি অস্থির হয়ে পড়ে। রোগীর কষ্ট না দেখতে পেরে আবার মদ খাইয়ে তার সর্বনাশ করা হয়। এক্ষেত্রে অহেতুক আবেগে অস্থির না হয়ে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া অথবা পরিকল্পিতভাবে মদ্যপান বন্ধ করার উদ্দেশ্যে আগে থেকেই কোন চিকিৎসা-কেন্দ্রে ভর্তি করিয়ে মদ বন্ধ করা দরকার। কিন্তু দেশী, পচুই, ধেনো, হাঁড়িয়া ইত্যাদিতে ভালভাবে অভ্যস্ত গরীব মানুষের কাছে এ ধরনের সুযোগই দুর্লভ। সেক্ষেত্রে চিকিৎসার আয়োজন হাতে না রেখে হঠাৎ মদ খাওয়া বন্ধ করা বিপজ্জনক। অন্ততঃ ঘুমের ওষুধ ও ভিটামিন বি-১ হাতে নিয়ে (এ সবের দাম এমন কিছু বেশি নয়) মদের নেশা ছাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া যায়। তবে সবার ক্ষেত্রেই প্রয়োজন মানসিকভাবে মদ খাওয়ার আগ্রহ নষ্ট করার জন্য উপযুক্ত সামাজিক, পারিবারিক ও অর্থনৈতিক পরিমণ্ডল এবং সত্যিকারের একজন বন্ধু ও শুভাকাঙ্ক্ষী (বা শুভাকাঙ্খিনী)। আর প্রয়োজন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সুরাসক্তি থেকে মুক্ত হওয়ার আন্তরিক ইচ্ছা। অন্যথায় কিছুদিন পরে, তথাকথিত বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে বা নিজের সুপ্ত ইচ্ছার বশে আবার মদের নেশা ধরাটা বিচিত্র কিছু নয়।

(৩) মদের পরোক্ষ প্রতিক্রিয়ায় মস্তিষ্ক ও নার্ভের রোগ—

মদ্যপানের ফলে শরীরে বিশেষত ভিটামিন বি-১ বা থায়ামিনের অভাব ঘটে। এর প্রাথমিক ও সর্বাধিক আঘাত পড়ে নার্ভকোষে। নার্ভকোষের কাজের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তির প্রধান উৎস শর্করা (কার্বোহাইড্রেট) জাতীয় খাদ্য। এই ধরনের খাদ্যের সুষ্ঠু বিপাকীয় ক্রিয়ায় এই ভিটামিন অন্যতম ও অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই এর অভাবে এ ধরনের খাদ্যের বিপাকীয় ক্রিয়া তথা নার্ভের কাজের জন্য শক্তির জোগান বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। (নার্ভের কাজের জন্য বিভিন্ন ধরনের ভিটামিন-বি প্রয়োজন ; ভিটামিন-ই-এর ব্যাপারটাও এখনো মানুষের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত নয়—তবু এর সম্ভাব্য কিছু ভূমিকা সম্পর্কে সাম্প্রতিক সন্দেহের কিছু অবকাশ রয়েছে। তবে এর অর্থ এ নয় যে ভিটামিন বি-কমপ্লেক্স দিলেই নার্ভ-এর কাজ ভাল হবে ; এবং এ ধরনের মিথ্যে প্রচার করেই নানা ওষুধ কোম্পানি নার্ভের জন্য হাজারো ভিটামিন-টনিক সাজিয়ে রাখে। অহেতুক এগুলি খেলে নার্ভের কাজ উন্নত তো হয়ই না, বরং নানা ক্ষেত্রে ক্ষতি করতে পারে ; আর গাঁটগচ্চা তো হয়ই। কোন ভিটামিনের অভাবে বিশেষ রোগ হয়েছে সুনিশ্চিত হলেই শুধু ভিটামিন দেওয়া যায়—যেমন হয় অ্যালকোহলের কারণে। কিন্তু অন্যত্র বা এলোপাথাড়ি নয়।)

অ্যালকোহলের ফলে নানাভাবে ভিটামিন বি-১-এর অভাব ঘটতে পারে। এর প্রধান দিকটি হল খাবারের পরিমাণ কমে যাওয়া। দৈনন্দিন কাজের জন্য প্রায় নির্দিষ্ট পরিমাণ শক্তির প্রয়োজন হয়—যা ক্যালরি দিয়ে পরিমাপ করা হয় (এ 'ক্যালরি' আসলে কিলোক্যালরি)। আগেই বলা হয়েছে এক গ্রাম অ্যালকোহল থেকে ৭ ক্যালরি শক্তি পাওয়া যায়। ফলে নিয়মিত মদ্যপান করলে প্রয়োজনীয় শক্তির অনেকটাই চলে আসে অ্যালকোহল থেকে। এবং অন্যান্য খাবারের প্রয়োজনই কমে যায়। এইভাবে অনেক সুরাসক্ত প্রধানত শুধু অ্যালকোহল থেকেই তার ক্যালরি সংগ্রহ করে। ফলে খাবার থেকে ভিটামিনের স্বাভাবিক জোগান অনেক, অনেক কমে যায়। অ্যালকোহলের ফলে ক্ষুধামন্দ্যও হয় এবং মদ কার্বোহাইড্রেটের বিপাকীয় ক্রিয়ার জন্য ভিটামিন বি-এর প্রয়োজনও বাড়িয়ে দেয়। আবার অন্ত্র থেকে ভিটামিনের শোষণও কমিয়ে দেয়। সব মিলিয়ে ভিটামিন বি-এর অভাব

ঘটে,—মূলত ভিটামিন বি-১ বা থায়ামিনের। এটিই একটি মাত্রায় পেঁছে ভয়াবহ নানা রোগের সৃষ্টি করে।

এর একটি হল ভার্নিক্'স্ ডিজিজ ও কোর্সাক্ফ'স সাইকোসিস (Wernicke's disease and Korsakoff's psychosis বা Wernicke-Korsakoff Syndrome ; Wernicke's encephalopathy বা acute superior hemorrhagic polioencephalitis)। এর প্রধান লক্ষণ হচ্ছে মনোবৈকল্য, চোখ নাড়ানোর অক্ষমতা এবং হাঁটাচলার অস্বাভাবিকত্ব।

চক্ষুগোলককে নাড়ায় যে সব মাংসপেশী (বিশেষত দুদিকের lateral recti) তার দুর্বলতা বা প্যারালিসিস ঘটে। ওপরের দিকে ও পাশের দিকে নাড়াতে গেলে চোখ ক্রমাগত নড়তে থাকে (vertical ও horizontal nystagmus)। দুটি চোখ দিয়ে একযোগে কোন দিকে দৃষ্টিনিবন্ধ করতে অসুবিধে হয়। চূড়ান্ত অবস্থায় একেবারে পারাই যায় না। তখন চোখের তারা (pupil) সংকুচিত হয়ে থাকে ও আলো ফেললে তার কোন পরিবর্তন ঘটে না (চোখের সম্পূর্ণ প্যারালিসিস হয়ে গেলে nystagmus চলে যায়)। বিরল ক্ষেত্রে চোখের পাতা নাচানো সম্ভব হয় না (অক্ষি-স্পুট প্রক্ষেপ বা ptosis) ও রেটিনায় রক্তপাত ঘটে—ফলে প্রায় অন্ধ অবস্থার সৃষ্টি হয়।

মাংসপেশীর অসমক্রিয়া (ataxia)-র ফলে দাঁড়ানো ও হাঁটা অস্বাভাবিক হয়ে পড়ে। প্রাথমিক দিকে লাঠি বা কোন সাহায্য ছাড়া দাঁড়ানো বা হাঁটাই যায় না। অবস্থার উন্নতি ঘটলেও পা ফাঁক করে একটু এলোমেলো হাঁটার প্রবণতা থেকেই যায় বেশ কিছুদিন। দু'একজনের ক্ষেত্রে কথার অসুবিধে (scanning speech) থাকে।

শতকরা ৯০ জনের ক্ষেত্রেই মনোবৈকল্য ঘটে। এদের পাঁচজনের একজনের মধ্যেই পূর্ববর্ণিত ডেলিরিয়াম ট্রেমেন্স-এর লক্ষণ দেখা যায়। বাকীদের মধ্যে অস্থিরতা, অমনোযোগ, পরিবেশের প্রতি আগ্রহের অভাব, সবকিছুতে চূড়ান্ত অনীহা, খুঁটিনাটি সবকিছুতে দিকবিভ্রম (disorientation), ঝিমুনি ভাব (চরম অবস্থায় তারও পরে অজ্ঞান অবস্থা ও মৃত্যু) ইত্যাদি থাকে। নিজের থেকে কথা বলার ইচ্ছে প্রায় থাকেই না। রোগীকে বহু প্রশ্ন জিগ্যেস করলে দু' একটার হয়তো উত্তর পাওয়া যায়, কখনো বা কথার মাঝখানে উত্তর বন্ধ হয়ে যায় ও রোগী ঘুমিয়ে পড়ে আর একটু ডাকলেই সে

জেগে ওঠে। তবে কথাবার্তায় কোন যুক্তি থাকে না, কাউকে ঠিকমত চিনে বা আশেপাশের পরিস্থিতি বিচার করে কথাবার্তা বলে না রোগী। প্রায় প্রতি মুহূর্তেই কথার প্রসঙ্গ পাল্টায়। সাধারণতঃ মানসিক এ ব্যাপার-গুলি চোখ ও মাংসপেশীর অসমক্রিয়ার কয়েকদিন বা দু' এক সপ্তাহ পরে দেখা দেয়।

কোর্সাকিফ্স সাইকোসিস-এর লক্ষণের একটি বড় দিক হল সাম্প্রতিক কোন স্মৃতি রোগী কয়েক মিনিটের বেশী ধরে রাখতে পারে না। আবার কয়েক দিন থেকে কয়েক বছর আগেকার স্মৃতি তার থাকে, কিন্তু তাকে মনে করা ও গুছিয়ে বলার ক্ষেত্রে অসুবিধে হয়। অনেক সময় গল্প বানানোও চলে (confabulations) ; রোগীকে কোন প্রশ্ন করলে সে তার উত্তর বেশ দক্ষ বক্তার মত বলে যায় হুড়হুড় করে—কিন্তু আসলে তার সঙ্গে মূল প্রশ্নের কোন সম্পর্ক নেই বা সেটি তার উত্তরই নয়, রোগী তার মনগড়া কিছু অবাস্তব মিথ্যে ধারণা অনুযায়ী বক্তৃতা দিতে থাকে।

এ সবের সঙ্গে ভিটামিনের অভাবজনিত অন্যান্য লক্ষণগুলিও থাকতে পারে (মুখে জিভে ঘা, পা-ফোলা ইত্যাদি) ; এমনকি তার কারণে হৃদপিণ্ডের কিছু অস্বাভাবিকত্বও, যেমন একটু পরিশ্রম করলেই শ্বাসকষ্ট, বসে উঠে দাঁড়ালে রক্তচাপ কমে গিয়ে মাথা ঘুরে যাওয়া, নাড়ীর দ্রুতগতি ইত্যাদি ইত্যাদি। কখনো কখনো রোগীর 'হার্ট ফেল' ক'রে (cardio-vascular collapse) হঠাৎ মৃত্যু ঘটতে পারে। থায়ামিনের অভাবের কারণে রক্তবহা নালীর প্রসারণ ঘটতে পারে ; এর কারণেও হৃদপিণ্ডের উপর চাপ পড়ে।

সব মিলিয়ে রোগটির চিকিৎসা জরুরি ভিত্তিতে হাসপাতালে করা দরকার। তবু এদের মধ্যে শতকরা ১৫-২০ ভাগ রোগীই মারা যায়। মৃত্যুর কারণ তীব্র জীবাণু আক্রমণ (নিউমোনিয়া, যক্ষ্মা, রক্তে জীবাণু দূষণ বা সেপ্টিসিমিয়া ইত্যাদি) অথবা সঙ্গের যকৃতের সিরোসিস। চোখের নড়াচড়া ও হাঁটাচলার অস্বাভাবিকত্ব ধরা পড়ামাত্র থায়ামিন দিয়ে চিকিৎসা শুরু করা উচিত। কয়েক ঘণ্টার দেরীও স্থায়ী মনোবৈকল্যের দিকে রোগীকে ঠেলে দিতে পারে, সৃষ্টি করতে পারে অন্যান্য জটিলতা, ত্বরান্বিত করতে পারে মৃত্যু। থায়ামিন দেওয়া হয় বেশ বেশি পরিমাণেই—এমনকি ইনজেকশন করে ১০০ মি.গ্রা.। ক্যালরির যোগান ঠিক রাখার উদ্দেশ্যে

গ্লুকোজ দিলে অতিরিক্ত ভিটামিন (থায়ামিন) অবশ্যই দিতে হবে। তীব্র অবস্থা কাটিয়ে ওঠার পর প্রায়শঃই মনোবৈকল্য থেকে যায়—যার অন্যতম দিক হল স্মৃতিভ্রংশ বা স্মৃতিবিলোপ (amnesic psychosis)। বাড়িতে সুস্থ, বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে রেখে মানসিক চিকিৎসাই এর প্রধান দিক। এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল মদের আওতা থেকে রোগীকে দূরে রাখা।

মদের কারণে মস্তিষ্কের সেরিবেলাম অংশেরও ক্ষয় (আপজাত্য বা degeneration) ঘটে। দীর্ঘদিন ধরে মদ খাওয়ার ফলে ধীরে ধীরে এর লক্ষণ প্রকাশ পায়। এ ক্ষেত্রেও দাঁড়ানো ও চলাফেরার অসুবিধে ঘটে। রোগী স্থির হয়ে সোজা দাঁড়াতে পারে না, চলতে গেলে টলে যায় বা পা সরে যায়। হাতের ও পায়ের সূক্ষ্ম কাজকর্ম (যেমন, ছবি আঁকা, তবলা বা গিটার বাজানো, লেখা ইত্যাদি) স্বাভাবিক ভাবে করা যায় না। কথাবার্তা, চোখের নড়াচড়া ইত্যাদিরও গণ্ডগোল থাকে। বিরল ক্ষেত্রে মদ্যপান বন্ধ করার ফলে অন্যান্য নার্ভের কিছু উন্নতি ঘটলেও সেরিবেলামের ক্ষতি একবার হয়ে গেলে আর উন্নতি হওয়া সম্ভব নয়। সেরিবেলামের মূল অংশের নার্ভকোষগুলির (বিশেষতঃ Purkinji cell) মৃত্যু ঘটে। ফলে অস্বাভাবিকত্বগুলি সুরাসক্ত ব্যক্তির জীবনের স্থায়ী সঙ্গী হিসেবে দাঁড়িয়ে যায়—মদ্যপান বন্ধ করলেও।

মদের কারণে থায়ামিনের অভাব ঘ'টে শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নানা নার্ভের অসুস্থতারও (polyneuropathy) সৃষ্টি হয়। ভার্নিক-কোর্সাকফ সাইকোসিসের রোগীর শতকরা ৮০ ভাগের ক্ষেত্রে এটি সংশ্লিষ্ট থাকতে পারে অথবা আলাদাভাবেও দেখা দিতে পারে। তবে এক্ষেত্রে থায়ামিন ছাড়া অন্যান্য ভিটামিন বি-এর অভাবও জড়িয়ে থাকে। এর ফলে নার্ভের পথ বরাবর ব্যথা থাকতে পারে এবং হাতে পায়ের অনভূতি, কাজ করার ক্ষমতা ও প্রতিবর্ত (reflex) ক্রিয়া অস্বাভাবিক হয়ে যায়।

একইভাবে চোখের নার্ভ-এর ব্যাধিও ঘটতে পারে (Optic neuropathy বা tobacco-alcohol amblyopia)। চোখে আবছা দেখা বা কম দেখার ব্যাপারটা ক্রমশঃ বেড়ে চলে। থায়ামিন ও অন্যান্য ভিটামিন-বি দিয়ে আর মদ বন্ধ করে চিকিৎসা না করা হলে, একসময় অপরিবর্তনীয় অন্ধত্বের সৃষ্টি হয়। এর পেছনে শুধু থায়ামিন নয়, অন্যান্য ভিটামিন-বি (যেমন

রাইবোফ্লাবিন)-এর অভাবও থাকে। (ধূমপান বা তামাকের ধোঁয়া থেকে সায়ানাইড দূষণ ঘটে। এর থেকেও এ ব্যাপারটি ঘটতে পারে বলে অনেকে মনে করেন—অবশ্য এটি এখনো বিতর্কিত অবস্থায় আছে। তবে এটা ঘটনা যে ধূমপান থেকেও চোখের একই ধরনের রোগের সৃষ্টি হতে পারে)।

মদ্যপানের ফলে মূল খাবারের পরিমাণ কমে যাওয়ার কারণে নায়াসিন্ (নিকোটিনিক অ্যাসিড) নামক আরেক ভিটামিন-বি-এর অভাব ঘ'টে পেলাগ্রা (pellagra) রোগের সৃষ্টি হতে পারে ; এতেও মূলতঃ মস্তিষ্কই আক্রান্ত হয়। অনিদ্রা, ক্লান্তি, অহেতুক ভীতি ও বিরক্তি, হতাশাবোধ, মনন ক্ষমতার ও স্মৃতিশক্তির হ্রাস ইত্যাদির সাঙ্গ পাতলা পায়খানা ও চামড়ার রোগ থাকে। শরীরের দু'দিকেই, যে অংশে সূর্যালোক লাগে সেখানেই, চামড়ার ক্ষত ও প্রদাহ হয়। অস্বাভাবিক অনুভূতি এবং মুখে-জিভে ঘা, মেয়েদের যোনি-প্রদাহ ইত্যাদি থাকে। চিকিৎসা না হলে শেষ পর্যন্ত মৃত্যু ঘটতে পারে। চিকিৎসা বিরাট জটিল কিছু নয়। অল্প পরিমাণ (দিনে ১০ মি. গ্রা.) নায়াসিন দিয়ে গেলেই রোগী ভাল হয়ে যায়। তবে অবশ্যই মদ বন্ধ করে, স্বাভাবিক খাবার (শষ্যজাত) খাওয়া প্রয়োজন।

(৪) **সুরাসক্তিজনিত মস্তিষ্কের ও নার্ভতন্ত্রের অন্যান্য রোগ ঃ**

এর মধ্যে **গর্ভস্থ শিশুর উপর** (fetal alcohol syndrome) প্রভাবের ব্যাপারটি আগে আলোচনা করে নেওয়া ভাল। গর্ভবতী মা যথেষ্ট পরিমাণে মদ্যপান করতে থাকলে অসহায় শিশুটির এই করুণ পরিণতি ঘটে। ওজনের তুলনায় তার শারীরিক দৈর্ঘ্য হয় বেশ কম, মস্তিষ্কের আয়তনও কম হয়। এর ফলে সারাজীবনের জন্য সে হয়ে যায় খর্ব ও মানসিকভাবে অনগ্রসর—বুদ্ধিবৃত্তি-মননক্ষমতাও কম হয়। চোখের ও চোয়ালের আকার ছোট হয়, চোখের দুই পাতার মাঝের ফাঁকটি হয় কম ও চোখের কোণে ভাঁজ পড়ে। মুখের তালু বিভক্ত হতে পারে (cleft palate)। হিপ-এর হাড়ের স্থানচ্যুতির প্রবণতা বাড়ে (dislocation of hip joint), হাতের আঙুল বেঁকে যায় (flexion deformity) এবং অন্যান্য গাঁটের নড়াচড়াও সীমিত হয়। হৃদ্‌পিণ্ডেরও জন্মগত গন্ডগোল থাকে—ভাল্‌ভ্‌গুলো ঠিকমত বন্ধ হয় না। যৌনাঙ্গ-এর আকার ও গঠন অস্বাভাবিক থাকে। শরীরের নানা স্থানে ছোট ছোট রক্তবহানালিকা প্রসারিত হয়ে দলা পাকিয়ে যায়।' যেন লাল লাল

গুটি (capillary hemangiomata)। সুরাসক্ত মায়ের সদ্যোজাত শিশুটি বুকের দুধও ঠিকমত টানে না, ঘুমোয় না ঠিকমত। এদের অনেকেই ঘ্যানঘেনে হয়, হাতপায়ের কাঁপুনি থাকে এবং খুব যেন বেশি করে হাত-পা ছোঁড়ে। নিয়মিত মদ খাওয়ার পরে তা বন্ধ করলে বড়দের যে সব লক্ষণ হয় (withdrawal syndrome) তাদের সঙ্গে এ অবস্থার মিল রয়েছে, তবে বড় তফাত একটি—শিশুদের এ অবস্থা হয় স্থায়ী, সারাজীবনের ব্যাপার। এ ধরনের শিশুদের মৃত্যুহারও বেশি। একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে এ ধরনের নবজাত শিশুর মৃত্যুহার হাজারে ১৭০। (উন্নত দেশগুলিতে সামগ্রিক শিশুমৃত্যুহার অনেক কম—যেমন ১৯৭৯ সালের হিসেবে আমেরিকায় এটি ১৫-এরও কম, ফ্রান্সে প্রায় ১০, ইংল্যাণ্ডে ১৩, সুইজারল্যাণ্ডে৮ ইত্যাদি।)

যে সব মা গর্ভাবস্থা জুড়ে মাঝারি পরিমাণে মদ খায় (প্রায় প্রতিদিন ৮০ মি. লি. অ্যালকোহল বা তার বেশি) তাদের এ ধরনের বাচ্চা জন্মাতে পারে। আরো কম মদ খাওয়ার ফলে গর্ভস্থ শিশুর উপর ঠিক কি ধরনের প্রভাব পড়ে তা এখনো সমীক্ষাসাপেক্ষ—তবে কমবেশি উপরোক্ত লক্ষণগুলিই দেখা দেয়। ঠিক কি কারণে শিশুটি এভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তা এখনো পরিষ্কার নয়। তবে জীন (gene) বা পুষ্টিগত কোন ব্যাপারের চেয়ে সরাসরি অ্যালকোহলের, তার বিপাকীয় ক্রিয়ায় জাত ও ভেজাল হিসেবে থাকা ক্ষতিকর পদার্থের প্রভাবই বেশি।

সুরাসক্ত বা মোটামুটি পরিমাণে মদ্যপানে অভ্যস্ত মায়েদের ক্ষেত্রে গর্ভস্থ শিশুর এইসব করুণ পরিণতি এড়ানোর উদ্দেশ্যে মদ্যপান বন্ধ করাই একমাত্র পথ। ডাইসালফিরাম বা এধরনের কিছু ওষুধ মায়ের মদ্যপান বন্ধের উদ্দেশ্যে বা সুরাসক্তি ছাড়ানোর জন্য ব্যবহার করা যায়। কিন্তু গর্ভবতী মায়েদের ক্ষেত্রে এর ব্যবহারও অত্যন্ত বিপদজনক, কারণ এটি উলটে গর্ভস্থ শিশুর আরো ক্ষতি করে। শুধু তাই নয়, যে মহিলা গর্ভবতী হননি, কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে গর্ভবতী হতে পারেন, তাঁদের ক্ষেত্রেও এসব ওষুধ প্রয়োগ করা উচিত নয়—কারণ ঐ সময় প্রয়োগ করলেও, ডাইসালফিরামের দীর্ঘস্থায়ী প্রভাবে ভ্রূণের ক্ষতি ঘটে। ডাইসালফিরাম (অ্যান্টাবিউজ)-এর প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্থ শিশুর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হল—তাদের হাত-পা স্বাভাবিক দৈর্ঘ্যের হতে পারে না, আকারে ছোট ছোট হয় (limb reduction deformity)।

এছাড়া সুরাসক্ত গর্ভবতী মহিলাদের গর্ভপাতের হারও বেশি।

সব মিলিয়ে শুধু নিজের শরীরের ও সমাজেরই নয়, শিশুর স্বার্থেও মহিলাদের মধ্যে মদ্যপান নিষিদ্ধ হওয়া উচিত। অবশ্য এর অর্থ এ নয় যে, পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে এ ব্যাপারে বিভেদ করা হচ্ছে। পুরুষদেরও সুরাসক্তি থেকে মুক্ত থাকা প্রয়োজন অবশ্যই। তবে মহিলাদের বাড়তি দায়িত্বের কথাটিও মনে রাখা দরকার।

পৃথিবীর যে সব দেশে সুরাসক্তি ব্যাপক হারে রয়েছে ও বাড়ছে সে সব দেশে এভাবে জড়বুদ্ধি, বিকলাঙ্গ শিশুর সংখ্যাও বাড়ছে। এমনকি রাশিয়ার মত দেশেরও বুদ্ধিজীবি সমাজ সচেতন মহল এ কারণে চিন্তিত। তাঁদের স্বীকারোক্তি, "১৯৮৩ সালে আমরা এত জড়বুদ্ধি শিশুর জন্ম দিয়েছি যে ১৯৯৩ সালে তারা হবে স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের অন্তত পনেরো ভাগ।" এদের একটা বড় অংশের পেছনে রয়েছে অ্যালকোহলের ভূমিকা। আমেরিকাও এ ব্যাপারে পিছিয়ে নেই স্বাভাবিকভাবেই—কারণ এদেশে ১৯৬৫ সালের তুলনায় ১৯৮০তে মদ্যপানের পরিমাণ বেড়েছে শতকরা ৩২ ভাগ। (বিস্তারিত তথ্যাদির জন্য 'সুরা ও সমাজ' অংশ দ্রষ্টব্য।)

মদের কারণে মস্তিষ্কের **পনস্‌** নামক আরেক অংশেরও বিশেষ কিছু ক্ষতি হয় (Central pontine myelinolysis বা CPM)। এ অংশের নার্ভকোষের খুব একটা ক্ষতি না হলেও, নার্ভকোষের মূল শরীর থেকে বেরিয়ে থাকা তন্তু (medullated fibres) ধ্বংস হতে থাকে। এর ফলে দুটি হাত, দুটি পায়ের প্যারালিসিস হয়ে যায় এবং এক অদ্ভুত ধরনের গভীর জ্ঞানহীন অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে (pseudocoma বা locked-in-syndrome)—যখন রোগী শুয়ে শুয়ে জেগে থাকে, চোখ মিট মিট করে সাড়া দিতে পারে, কিন্তু অন্য কোনভাবে নয়—কথা-হাত-পা নাড়া সব বন্ধ। কখনো বা রোগী অকারণে প্রচন্ড হাসতে বা কাঁদতে থাকে, শ্বাসপ্রশ্বাস মাঝে মাঝে দ্রুত তারপর ধীরে ধীরে হয় (Cheyne-Stoke's Breathing)।

বিরল কারো কারোর ক্ষেত্রে মস্তিষ্কের **কর্পাস ক্যালোসাম** নামক অংশের ক্ষয় ঘটে (primary degeneration of the corpus callosum বা Marchiafava-Bignami disease)। ইটালির লাল মদে আসক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে এটি প্রথম আবিষ্কৃত হয়। এর ফলে মানসিক ও আবেগগত গন্ডগোল দেখা দেয়, বুদ্ধিবৃত্তি ও ব্যক্তিত্ব পরিবর্তিত হয়ে যায়। কাজের উদ্যম ও

ক্ষমতা কমে যায়, দৈনন্দিন কাজে অনীহা আসে, সামাজিক সম্পর্কবোধ কমে যায়। একদা গম্ভীর ব্যক্তি শিশুসুলভ কাজকর্ম ও বোকার মত রসিকতা করতে থাকে। অকারণে প্রচণ্ড আনন্দ বা আবেগে ভেসে যাওয়া অথবা বিরক্তিবোধ হতে পারে। মনোযোগ দিয়ে ও পরিকল্পনা করে কাজ করার অক্ষমতা, সাম্প্রতিক স্মৃতির আংশিক লোপ, কাজে দ্বিধা ও অমনোযোগ, বুদ্ধিবৃত্তি কমে যাওয়া ইত্যাদি এ অবস্থার আরো কয়েকটি দিক। দাঁড়ানো ও হাঁটাচলার উপরও স্বাভাবিক নিয়ন্ত্রণ থাকে না। এসবের সঙ্গে মৃগী রোগের মত মাঝে মাঝে খিঁচুনি, হাত-পা কাঁপা ও শক্তভাব, প্যারালিসিস, কথা বন্ধ হওয়া ইত্যাদিও থাকতে পারে। আপনা থেকেই,—রোগীর ইচ্ছা নিরপেক্ষভাবে, কোন জিনিস ধরে রাখার প্রবণতার সৃষ্টি হয় (grasping reflex)—রোগীর হাতে কোন জিনিস রাখলেই আপনা থেকে আঙুল ও কনুই ভাঁজ হয়ে যায়, ঐ জিনিসটা সরাতে গেলে ব্যাপারটি আরো বাড়তে থাকে। মদ্যপান সম্পূর্ণ বন্ধ করে ও উপযুক্ত পুষ্টিকর খাবার-দাবারের ব্যবস্থা করলে, ধীরে ধীরে এ অবস্থা থেকে রোগী সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারে।

মদের কারণে মানসিকতারও এক ধরনের বিচিত্র পরিবর্তন ঘটতে পারে (alcoholic dementia)। অতিমাত্রায় ঈর্ষাবোধ ও সন্দেহপ্রবণতা (বিশেষত স্ত্রী বা স্বামীর প্রতি) এর অন্যতম। মস্তিষ্কের সেরিব্রাম অংশের উপর মদের বিষাক্ত প্রভাবের অন্যতম দিক এটি। ঠিক আগেই যে মানসিকতা ও ব্যক্তিত্বের পরিবর্তনের কথা বলা হয়েছে, এক্ষেত্রে সেসবও থাকে। তবে কথা বলার অসুবিধা খুব একটা থাকে না। আর স্মৃতি-ভ্রংশের সঙ্গে আচরণগত বৈকল্য ও গঠনমূলক কাজের দায়িত্ব নেওয়ার অক্ষমতা স্পষ্টভাবে থাকে।

প্রায় এ ধরনের আরেকটি অবস্থায় সেরিব্রামের কর্টেক্স অংশের নার্ভকোষগুলির মৃত্যু ঘটতে থাকে (alcoholic creberal atrophy) বলে অনেকে মনে করেন। তবে এটি এখনো বিতর্কিত ও গবেষণাসাপেক্ষ। কোন লক্ষণ ছাড়াই এটি থাকতে পারে এবং স্ক্যানিং-এ মস্তিষ্কের ভেতরে যে ফাঁকা অংশ থাকে (ventricles) সেগুলি স্বাভাবিকের চেয়ে বড় বলে ধরা পড়ে। এ অবস্থার পুরোপুরি উন্নতিও ঘটে। তাই মনে করা হয়, সুরাসক্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে এই ফাঁকা অংশে মস্তিষ্ক ও মস্তিষ্ক আবরণীর

মধ্যবর্তী জলীয় তরল পদার্থ (Cerebro spinal fluid) কোনভাবে বেশি চলে আসে।

মদ্যপানের ফলে **মাংসপেশী ও হৃদপিন্ডের মাংসপেশীও** আক্রান্ত হয় (alcoholic myopathy ও cardiomyopathy)। শুধু যে মদ থেকে এ রোগ হয় তা নয়, মদ না খেলেও এ ধরনের অসুস্থতা হতে পারে, তবে সুরাসক্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে এটি ঘটে অনেক বেশি। প্রচুর মদ খেতে খেতে একদিন একসময় হঠাৎ সারা গায়ের নানা মাংসপেশীতে তীব্র যন্ত্রণা শুরু হয়; চাপ দিলে লাগে, ক্র্যাম্প হয়, মাংসপেশী ফুলে যায় ও দুর্বল হয়ে পড়ে। মাংসপেশীর কোষসমূহের মৃত্যু ঘটতে থাকে (rhabdomyolysis)। কারোর ক্ষেত্রে আবার কয়েকদিন বা কয়েক সপ্তাহ ধরে ধীরে ধীরে হাত-পায়ের ছাড়া মূলত অন্যান্য মাংসপেশীর দুর্বলতা দেখা দেয়, কিন্তু কোন যন্ত্রণা থাকে না। রক্তে পটাশিয়ামের পরিমাণ কমে যায়, ধীরে ধীরে মাংসপেশী শুকিয়ে যায়। এদের ক্ষেত্রে নার্ভের রোগও থাকে। মদ বন্ধ করে, স্বাভাবিক খাবার খেলে প্রায়শঃই অবস্থার সম্পূর্ণ উন্নতি ঘটে। সঙ্গে ভিটামিন-বি দেওয়ার দরকার হয় ও ফসফেট দেওয়া যেতে পারে। কয়েক বছর ধরে ভালমাত্রায় মদ খেয়ে গেলে হৃদপিণ্ডের মাংসপেশী বেশ ভালভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এদের অনেকের হঠাৎই হার্টফেল করে মৃত্যু ঘটে। অন্যথায় শ্বাসকষ্ট ও সামান্য পরিশ্রমে সে কষ্ট বেড়ে যাওয়া, মাঝে মাঝে হৃদপিণ্ডে ব্যথা ও অজ্ঞান হয়ে যাওয়া, দুর্বলতা ইত্যাদি থাকে। সরাসরি অ্যালকোহলের কারণে হৃদপিণ্ডের এই যে রোগ হয় সেটি ভিটামিন-বি-১ (থায়ামিন)-এর অভাবজনিত (বেরিবেরিতে বা অ্যালকোহলের পরোক্ষ প্রভাবে) হৃদপিণ্ডের রোগের থেকে আলাদা—আগেরটিতে হৃদপিণ্ড কম রক্ত বাইরে পাঠায়, পরেরটিতে বেশি; আগেরটিতে শরীরের রক্তবহা নালীর আংশিক সংকোচন থাকে, পরেরটিতে প্রসারণ। তাই অ্যালকোহল জনিত হৃদপিণ্ডের এ অবস্থার চিকিৎসা ভিটামিন বি-১ দিয়ে করা সম্ভব নয় (যদিও সুরাসক্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই ভিটামিনের কিছু অভাব সংশ্লিষ্ট থাকতে পারে এবং তার জন্য ভিটামিন দেওয়া যায়)। এ অবস্থা ধরাপড়া মাত্র সম্পূর্ণ ও চিরতরে মদ্যপান বন্ধ করাই প্রধান চিকিৎসা।

(৫) **যকৃতের সিরোসিসজনিত মস্তিষ্কের অসুস্থতা:** ঠিক পরেই

আলোচনা করা হয়েছে কিভাবে সুরাসক্ত ব্যক্তিদের যকৃৎ স্থায়ীভাবে নষ্ট হতে থাকে ও তার কাজ অস্বাভাবিক হয়ে পড়ে। এর আঘাত পুরো শরীরেই পড়ে,—নার্ভ ও মস্তিষ্ক তার ব্যতিক্রম নয়। যকৃতকোষের স্বাভাবিক কাজ যেমন নষ্ট হয়, তেমনি যকৃতের স্থায়ী পরিবর্তন ও হ্রাসমান স্থিতিস্থাপকতার কারণে অন্ত্র থেকে আসা রক্ত তার স্বাভাবিক গতিপথে, যকৃতের ভেতর দিয়ে, না গিয়ে সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। সব মিলিয়ে রক্তের যে সব দূষিত পদার্থ যকৃতে নিরাপদ পদার্থে রূপান্তরিত হত, সেগুলি আর পরিবর্তিত হতে পারে না এবং মস্তিষ্কে জমা হতে থাকে। এদের মধ্যে অ্যামোনিয়া সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। এছাড়া মিথিওনিন, মার্কাপটানস, ফ্যাটি অ্যাসিড (short-chain fatty acids) ও আরো কিছু কিছু পদার্থের (যেমন false neurotransmitter substances, aromatic and branched chain amino acids ইত্যাদির) ভূমিকাও আছে বলে মনে করা হয়। এছাড়া যকৃৎ এমনও কিছু পদার্থের যোগান দেয় যা মস্তিষ্কের সুস্থ কাজের পক্ষে প্রয়োজনীয়। সিরোসিসে এ ধরনের পদার্থ কমে গিয়েও মস্তিষ্ককে অসুস্থ করে তোলে। সুরাসক্ত ব্যক্তির অসুস্থ যকৃতের কারণে মস্তিষ্কের যে ক্ষতি হয় তার প্রকাশ তীব্রভাবে দেখা দিলেও সঠিক চিকিৎসা করালে ঠিকও হয়ে যেতে পারে, কিন্তু তা না করা হলে ও মদ খাওয়া বন্ধ না হলে এ ক্ষতি স্থায়ী ক্ষতির দিকে চলে যায়—যকৃতের সিরোসিসের মত মস্তিষ্কের এ ক্ষতির কারণেও নার্ভকোষের মৃত্যু ঘটে, যার পুনর্জীবন আর কোনভাবে সম্ভব নয়।

সিরোসিসের কারণে মস্তিষ্ক আক্রান্ত হয়ে রোগী গভীরভাবে অচেতন হয়ে পড়ে (কোমা) ও মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যেতে পারে (Hepatic encephalopathy, stupor and coma)। কয়েকটি ঘটনা এক্ষেত্রে পূর্বশর্ত হিসেবে কাজ করে। সিরোসিসের কারণে পরিপাকতন্ত্রের ভেতরে রক্তক্ষরণ হতে পারে। এ ধরনের তীব্র রক্তক্ষরণে হঠাৎই অনেক বেশি পরিমাণে অ্যামোনিয়া ও অন্যান্য নাইট্রোজেন যুক্ত ক্ষতিকর পদার্থ সৃষ্টি হয়—অক্ষম যকৃৎ যার সামাল দিতে পারে না। একইভাবে যকৃতের সিরোসিসে ভোগা রোগী হঠাৎ বেশী পরিমাণে প্রোটিনযুক্ত খাবার খেলেও (যেমন, একসঙ্গে প্রচুর মাছ, মাংস, ডিম, দুধ) এ ঘটনা ঘটে। প্রোটিন থেকে বেশি পরিমাণে অ্যামোনিয়া ইত্যাদি সৃষ্টি হয়। এগুলি একইভাবে যায় মস্তিষ্কে ও

মস্তিষ্ক সেগুলিকে সহ্য করতে পারে না, রোগী আচ্ছন্ন বা অজ্ঞান হয়ে পড়ে। কোন কারণে প্রচন্ড বমি বা প্রস্রাব হয়েও (যার থেকে হয় hypokalemic alkalosis) এ ধরনের ব্যাপার ঘটতে পারে। নিউমোনিয়া, বৃক্ক-মূত্রনালি ইত্যাদির বা অগ্ন্যাশয়ের তীব্র জীবাণু আক্রমণ—এগুলিও অজ্ঞান হয়ে পড়ার পূর্বশর্ত হিসেবে কাজ করতে পারে, যদিও এটি ঠিক কিভাবে ঘটে তা পরিষ্কার নয়। তবে ব্যাপারটি আরো বেশি বিপজ্জনক, কারণ এগুলিকে আলাদা করে নির্ণয় করা ও তাদের উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যাপারটা জটিল হয়ে পড়ে। ভাইরাসের আক্রমণজনিত যকৃতের প্রদাহ, টিউমার বা পিত্তপাথুরীতে পিত্তনালী বন্ধ হয়ে যাওয়া, অস্ত্রোপচার, হৃদ্‌পিণ্ডের কোন রোগ, কোন জীবাণু সংক্রমণ—এ ধরনের যে সব ক্ষেত্রে যকৃতের কাজ আরো ক্ষতিগ্রস্ত হয় সেগুলিও 'কোমা'-র অর্থাৎ hepatic encephalopathy-র পূর্বশর্ত হতে পারে।

অবশ্য হেপাটিক এনকেফালোপ্যাথি অর্থাৎ যকৃতের কারণে মস্তিষ্ক আক্রান্ত হলেই গভীর অচেতন বা কোমার অবস্থা হয় না—এটি ঘটে সব শেষে। এ অবস্থাকে চারটি স্তরে ভাগ করা যায়। প্রথম অবস্থায় অতি মাত্রায় ফূর্তি বা হতাশাবোধ, কিছু মনোবৈকল্য, জড়িয়ে যাওয়া কথা ও ঘুমের গন্ডগোল থাকে। মস্তিষ্কের তড়িৎ পরীক্ষায় (Electro-encephalogram বা E. E. G.) অস্বাভাবিকত্ব থাকে না। আর যকৃতের কারণে হাত-পা-শরীর-মাথার বিশেষ ধরনের অস্বাভাবিক সঞ্চালন (asterixis বা liver-flap) থাকতেও পারে, নাও থাকতে পারে। পরবর্তী স্তরে ক্লান্তি ও আরো বেশি মনোবৈকল্য দেখা দেয়। এখান থেকেই মস্তিষ্কের তড়িৎ পরীক্ষায় অস্বাভাবিকত্ব অবশ্যই ধরা পড়ে। পাখীর ডানা নাড়ার মত হাতের নড়াচড়া (liver-flap) অবশ্যই থাকে। তৃতীয় স্তরে মনোবৈকল্য আরো তীব্র হয়, কথার মধ্যে কোন সামঞ্জস্য থাকে না, রোগী ঘুমিয়ে পড়ে কিন্তু তাকে এ ঘুম থেকে তোলা যায়। এক্ষেত্রেও liver flap অবশ্যই থাকে। সর্বশেষ স্তরে রোগী গভীর অচেতন অবস্থায় থাকে (hepatic coma) ; যন্ত্রণাদায়ক উত্তেজনা প্রয়োগ করেও রোগীর সাড়া নাও পাওয়া যেতে পারে এবং liver flap-ও আর দেখা যায় না। এ অবস্থায় রোগীর মুখে ও প্রস্রাবে পায়খানার মত দুর্গন্ধ পাওয়া যেতে পারে (fetor hepaticus)। হেপাটিক এনকেফালোপ্যাথির কারণে মৃত্যু প্রায় অবধারিত।

হেপাটিক কোমা-র চিকিৎসা হাসপাতালেই করা উচিত—যদি রোগীকে বাঁচানো যায় এই আশায়। নিওমাইসিন, ল্যাকটুলোজ, সাময়িকভাবে প্রোটিন ছাড়া খাবার ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি নেওয়া হয়।

উপরোক্ত বর্ণনার বাইরেও 'সুরাসক্ত' যকৃতের কারণে মস্তিষ্কের ক্ষতি দুরারোগ্যভাবে ধীরগতিতে দেখা দিতে পারে (chronic progressive hepato-cerebral degeneration)। মদ্যপানের কারণে যকৃতের সিরোসিস রোগীর মস্তিষ্ক এভাবে আক্রান্ত হলে ধীরে ধীরে মস্তিষ্কের নার্ভকোষ মারা পড়তে থাকে। বুদ্ধিবৃত্তি ও মননক্ষমতা হ্রাস পেতে থাকে, হাত-পায়ের কাঁপুনি হতে থাকে এবং অনিচ্ছাসত্ত্বেও হাত-পায়ের বিকৃত সঞ্চালন দেখা দেয়। কোমা হওয়ার কয়েক মাস আগে থেকে কোন কোন রোগীর ক্ষেত্রে সুষুম্নাকান্ড (spinal cord) আক্রান্ত হয়ে (myelopathy) পায়ের আংশিক প্যারালিসিস ও শক্তভাব দেখা দিতে পারে।

এসব ক্ষেত্রেও কম প্রোটিন যুক্ত খাবার ও অল্প পরিমাণ নিওমাইসিন বা ল্যাকটুলোজ দেওয়া যায়।

যকৃৎ

ঠিক আগেই মদ খেয়ে লিভারের বারোটা বাজার কারণে এত সব যা কিছু ঘটার কথা বলা হল সেগুলি যকৃৎ বা লিভারের উপর মদের ভয়াবহ প্রভাব সম্পর্কে প্রাথমিক একটা ধারণা দিতে যথেষ্ট। তার আগে যকৃতের কাজ সম্পর্কে একটা প্রাথমিক ধারণা থাকা ভাল।

যকৃৎ বা লিভার আমাদের শরীরের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি অংগ। প্রোটিন, ফ্যাট (চর্বি), কার্বোহাইড্রেট (শর্করা)—তিন ধরনের খাবারের জটিল বিপাকীয় ক্রিয়ায় এর অতি গুরুত্বপূর্ণ, বিকল্পহীন ভূমিকা রয়েছে। যকৃতে চর্বিজাতীয় খাদ্যের জারণক্রিয়া ঘটে। এখানে ফসফোলিপিড তৈরি হয়, প্রোটিন ও কার্বোহাইড্রেট থেকে ফ্যাটজাতীয় পদার্থের রূপান্তরও ঘটে এখানে। যকৃৎ কোষ ল্যাকটিক অ্যাসিড, পাইরুভিক অ্যাসিড ও গ্লিসারলকে এবং অন্যান্য সরল শর্করা অণুকে গ্লুকোজ ও গ্লাইকোজেনে পরিণত করে। ব্লাড সুগার নিয়ন্ত্রণে যকৃতের ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ খাদ্যের শক্তিদায়ী ক্ষমতাকে বাড়িয়ে তোলার ক্ষেত্রে (specific dynamic action)

প্রোটিনের ক্ষমতা সবচেয়ে বেশী (৩০%) এবং প্রোটিনের এই কর্মক্ষমতার একমাত্র স্থান যকৃৎ। যকৃতে কিছু অ্যামাইনো তৈরি হয়, এবং আরো গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে রক্তের সমস্ত প্রোটিন—অ্যালবুমিন, গ্লোবুলিন, ফিব্রিনোজেন—যকৃৎ তৈরি করে।

গর্ভস্থ ভ্রূণের রক্ত তৈরির অন্যতম স্থান যেমন যকৃৎ, তেমনি বয়স্কদের ক্ষেত্রে লোহিত কণিকার তৈরি ও আয়ুষ্কাল নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রেও এর পরোক্ষ-প্রত্যক্ষ ভূমিকা রয়েছে। রক্ত জমাট বাঁধার মত অতি প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়ার জন্য যে সব পদার্থের ভূমিকা জরুরি সেগুলিও তৈরি করে যকৃৎ।

যকৃৎ পিত্ত তৈরি করে যা চর্বিজাতীয় খাদ্যের হজম করা এবং তার সাঙ্গ ভিটামিন-এ.-ডি.-ই ও-কে-র শোষণে একান্ত প্রয়োজনীয় দায়িত্ব পালন করে। যকৃৎ ভিটামিন-এ তৈরিও করে।

কিছু ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ, ব্যাকটেরিয়া ও ওষুধপত্র যকৃতের মাধ্যমে শরীর থেকে দূর হয় বা নিরাপদ কম ক্ষতিকর পদার্থে রূপান্তরিত হয়। ইস্ট্রোজেনের মত নানা হরমোনের বিপাকীয় ক্রিয়াও ঘটে যকৃতে—যার ফলে শরীরে এদের স্বাভাবিক মাত্রা বজায় থাকে।

রোগ প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজনীয় অ্যান্টিবডি তৈরির ক্ষেত্রেও যকৃতের অবদান যথেষ্ট।

সব মিলিয়ে শরীরকে সুস্থ-সুন্দর রাখার জন্য যকৃতের দায়িত্ব সুবিশাল এবং বহু ক্ষেত্রেই তার কোন বিকল্প নেই। কিন্তু মদ্যপানে ধীরে ধীরে যকৃৎ কোষ ধ্বংস হতে থাকে, বিপর্যস্ত হতে থাকে তার কর্মক্ষমতা।

মদ্যপানের ফলে প্রাথমিক অবস্থায় যকৃতে চর্বিজাতীয় খাদ্যের বিপাকীয় ক্রিয়া (lipid metabolism) ক্ষতিগ্রস্ত হতে শুরু করে এবং এর ফলে রক্তে ট্রাইগ্লিসারাইডের পরিমাণ বাড়তে থাকে। ট্রাইগ্লিসারাইডের এই উচ্চমাত্রা পুরো শরীরের পক্ষেই ক্ষতিকর। এর ফলে রক্তবহা নালীর স্থায়ী পরিবর্তন (atherosclerosis) দ্রুততর হয় আর তার থেকে হার্ট অ্যাটাক, স্ট্রোক বা প্যারালিসিস ইত্যাদি প্রাণঘাতী ও ভয়াবহ ঘটনার সম্ভাবনা ক্রমশঃ বেড়ে চলে। মুটিয়ে যাওয়া আর তাড়াতাড়ি বুড়িয়ে যাওয়ার ব্যাপারটাও (ageing) সরাসরি এটির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

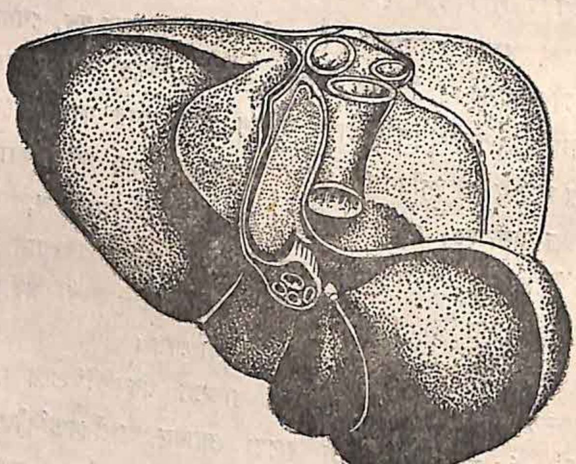
সুরাসক্তির কারণে যকৃতে চর্বিজাতীয় খাদ্যের বিপাকীয় ক্রিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হতে হতে পরবর্তী স্তরে যকৃৎ-এর স্হায়ী পরিবর্তন ঘটতে থাকে ; শুরুর

দিকে এভাবে অসুস্থ যকৃতের নাম ফ্যাটি লিভার (fatty liver)। যকৃতের কোষে চর্বি (triglyceride) জমতে থাকে এবং এর চাপে নিউক্লিয়াস কোষের প্রান্তে সরে যায়। যকৃতের এ ধরনের পরিবর্তন অতি সামান্য পরিমাণে ঘটলে, সেটি আবার ঠিক হয়ে যেতে পারে। যেমন কয়েকদিন মদ খাওয়ার পর সম্পূর্ণ ছেড়ে দিতে পারলে এবং সঙ্গে প্রোটিন ভিটামিনযুক্ত পুষ্টিকর খাবারের জোগান ঠিক থাকলে যকৃতের এই প্রাথমিক ক্ষতিটা সামাল দেওয়া যায়। মানুষের ক্ষেত্রে দেখা গেছে,—বেশি নয়, মোটামুটি পরিমাণে মদ খেলেই অতিদ্রুত যকৃতের এই পরিবর্তন (acute fatty changes) ঘটতে পারে, দীর্ঘস্থায়ী পরিবর্তন (chronic changes) তো হয়ই। সঙ্গে খাবারে প্রোটিনের অভাব থাকলে এসব পরিবর্তন দ্রুততর হয়, যেমন ঘটে গরিব মানুষদের মধ্যে। বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির ক্ষেত্রে অ্যালকোহলের প্রতি অস্বাভাবিক সংবেদনশীলতার কারণে মদ্যপানের ফলে অপেক্ষাকৃত কম সময়ের মধ্যেই এই পরিবর্তন ঘটতে পারে এবং এর ফলে জ্ঞান হারানো, অতিরিক্ত রক্তপাত, জণ্ডিস ইত্যাদি দেখা দিতে পারে খুব তাড়াতাড়ি। ফ্যাটি লিভার-এর অবস্থা তবু মন্দের ভাল, কারণ মদ্যপান সম্পূর্ণ বন্ধ করলে ও খাবার ঠিক থাকলে তা ঠিক হয়ে যায়—অবশ্য মদ্যপান আবার শুরু করলে আরো দ্রুত এটি আবার দেখা দেয়।

কিন্তু মদ্যপান চালিয়ে যেতে থাকলে পরবর্তী স্তরে যকৃতকোষ-এর যে পরিবর্তন হতে থাকে তা আরো ভয়াবহ, অপরিবর্তনীয়, প্রাণঘাতী। এ অবস্থার শুরুর দিকে হয় অ্যালকোহল জনিত যকৃতের প্রদাহ (alcoholic hepatitis)। যকৃৎ কোষ মারা পড়তে থাকে। মৃত যকৃৎ কোষের চারপাশ ঘিরে ফেলে শ্বেতরক্ত কণিকা (polymorphonuclear leukocytes ও lymphocytes) আর মৃত যকৃৎকোষের ভেতরে থাকে তার কংকালের মত অবশেষ—যার নাম ম্যালরি বডি (Mallory bodies বা alcoholic hyaline)। অনুবীক্ষণযন্ত্রে যকৃৎকোষ পরীক্ষা করে এই ম্যালরি বডি পাওয়া গেলে তা প্রায় সুনিশ্চিত ভাবে এ্যালকোহলজনিত যকৃৎ প্রদাহ নির্দেশ করে, অবশ্য আরো কিছু কিছু ক্ষেত্রেও এর উপস্থিতি কখনো কখনো ধরা পড়তে পারে (যেমন Wilson's disease, primary biliary cirrhosis, hepatocellular carcinoma ও intestinal bypass surgery-র পরে)। আর ভারত উপমহাদেশীয় অঞ্চলে শিশুদের মধ্যে

যে সিরোসিস হয় সেক্ষেত্রেও প্রায়ই এটি পাওয়া যায়। যাই হোক শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতার সাথে যকৃতের এধরনের প্রদাহের সম্পর্ক রয়েছে বলেও মনে করা হয়।

অ্যালকোহল জনিত এই যকৃতের প্রদাহ কারো কারোর ক্ষেত্রে কোন লক্ষণ ছাড়াই থাকতে পারে, আবার কারো কারোর ক্ষেত্রে যকৃতের কাজ স্তব্ধ হয়ে মৃত্যুও ডেকে আনতে পারে। তবে প্রায়শঃই সাধারণ কিছু লক্ষণ দেখা যায়—যেমন বমিবমিভাব, পেটে অস্বস্তি, ওজন কমে যাওয়া ও জণ্ডিস; দু'জনের মধ্যে একজনের ক্ষেত্রে জ্বরও থাকতে পারে।



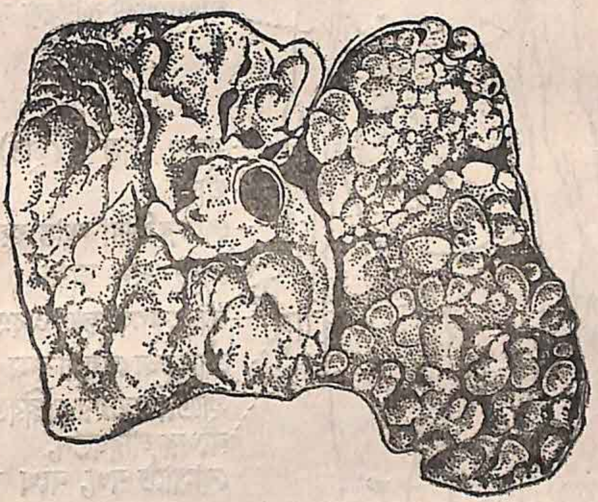
যকৃতের স্বাভাবিক চেহারা (পেছন থেকে)

লিভার বড় হয় ও তাতে চাপ দিলে ব্যথা হয়। প্লীহাও কারো কারোর ক্ষেত্রে বাড়তে পারে। সব মিলিয়ে ব্যাপারটি প্রায়শঃই ভাইরাস জনিত যকৃতের প্রদাহের সাথে গুলিয়ে যায়, কারণ এক্ষেত্রেও প্রায় এসব লক্ষণই থাকে, আর এর ফলে রোগের মূল কারণ যে মদ তা চাপা পড়ে যায়। তাই মদ খাওয়া আর বন্ধ হয় না। আর, এ কারণে ধীরে ধীরে পেটে জল জমে, হাত-পা-মুখ ফুলতে থাকে, জণ্ডিস বাড়তে থাকে, এর থেকে মস্তিষ্কও ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে মৃত্যু ঘটতে পারে।

এ অবস্থা রোধ করা ও তার চিকিৎসার প্রথম ও প্রধান শর্ত হচ্ছে মদ খাওয়া বন্ধ করা। সাথে প্রোটিন যুক্ত খাবার (শরীরের ওজনের

প্রতি কিলোগ্রাম পিছু অন্ততঃ এক গ্রাম প্রোটিন) এবং উপযুক্ত ক্যালরি (২০০০-৩০০০ কিলো ক্যালরি) দেওয়া দরকার। সারাদিনের খাবারকে ৩-৪ ভাগে ভাগ করে খাওয়া ভাল। ভিটামিনও দেওয়া যায়। কিন্তু এসব যাই করা হোক না, সঙ্গে মদ খেলে এরা যকৃৎকে কোনভাবে বাঁচাতে পারে না। মদ সম্পূর্ণ, চিরতরে বন্ধ করা উচিত।

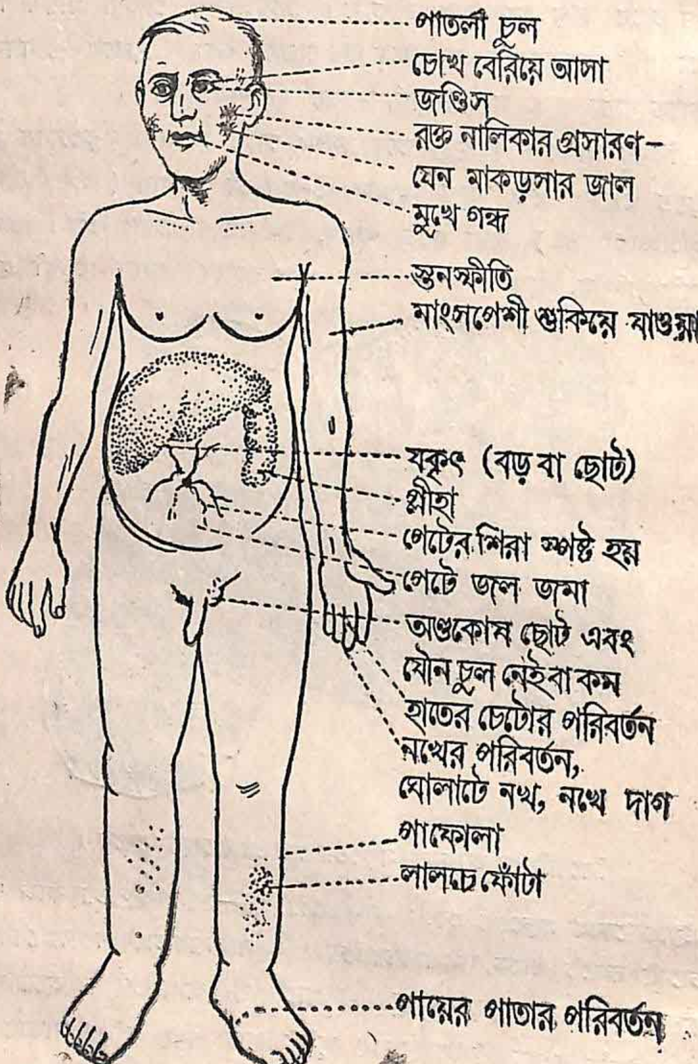
কিন্তু তা যদি না হয়, তবে ক্রমশঃ বেশি সংখ্যায় যকৃৎকোষ মারা পড়তে থাকে এবং মৃত অঞ্চলে তন্তুজাতীয় কোষ (fibroblast ও myofibroblast) জমা হতে থাকে, কোলাজেন তৈরি হয়। এসবই অপরিবর্তনীয়, স্থায়ী ক্ষতি। মৃত যকৃৎ কোষের স্থানে তৈরী হওয়া



সিরোসিসে আক্রান্ত যকৃতের চেহারা (পেছন থেকে)

এইসব কোষ যকৃতের কোন কাজ করে না—ফলে যকৃতের কাজ স্থায়ী ভাবেই কমতে থাকে, বিপাকীয় ক্রিয়ায় ও সামগ্রিকভাবে শরীরে যে অজস্র গুরুত্বপূর্ণ কাজে যকৃতের ভূমিকা থাকে তা অস্বাভাবিক হয়ে পড়ে। নতুন তৈরি হওয়া এই সব কোষ বৃদ্ধি পায় এবং গুটির আকার ধারণ করে, যকৃতের মসৃণ বাইরের চেহারাটি নষ্ট হয়ে গুটি গুটি হয়ে যায়— যেন পাহাড় আর খাদে ভরা চাঁদের গা। যকৃতের প্রকৃত কার্যকরী অংশ ক্রমশঃই কমে যেতে থাকে এবং নরম যকৃৎ ক্রমশঃ শক্ত হয়ে যায় এবং রক্তবহা নালীর উপর চাপ পড়ে। সব মিলিয়ে যকৃতে সুরাসক্তির চরম এই

প্রভাবকে বলা হয় সিরোসিস (alcoholic cirrhosis)। যকৃতের সিরোসিস নানা ধরনের হতে পারে। অ্যালকোহল জনিত সিরোসিসে সাধারণত যকৃতে



যকৃতের সিরোসিসের কারণে শরীরের নানা অংশে নানা লক্ষণ

সৃষ্টি হওয়া গুটিগুলি হয় আকারে ছোট (৩-৪ মি. মি. ব্যাসের)। এক্ষেত্রে যকৃতের পুরোটা জুড়েই ছোট ছোট গুটি ছড়িয়ে থাকে এবং প্রায়শঃই

যকৃৎ আকারে বড় হয়। (Micronodular cirrhosis ; একে অনেকসময় portal, septal বা Laennec's cirrhosis-ও বলা হয়।) (ভাইরাসের কারণে জন্ডিস হওয়া অর্থাৎ যকৃতের প্রদাহের থেকেও সিরোসিস হতে পারে। এতে যকৃতের গুটিগুলি আকারে বড় হয়, এক বা তার বেশি সে. মি. ব্যাসের। যকৃৎ সাধারণত আকারে ছোট হয়ে যায় এবং স্থানে স্থানে গুটি দেখা য়ায।)

মদ খাওয়া না কমালে অনিবার্য গতিতে—যতক্ষণ যকৃতের কিছু কোষ জীবিত থাকে ততক্ষণ, এই ভয়াবহ পরিণাম ঘটতে থাকে। অবশ্য সব কোষ নষ্ট হওয়ার আগেই যকৃতের মালিক নানাভাবে মারা পড়ে। মদ খাওয়া সম্পূর্ণ বন্ধ করে উপযুক্ত চিকিৎসা করালে তবু ঐ অবস্থাতেই এই পরিণাম রোধ করা যায়—কখনো বা সামান্য কিছু নতুন যকৃৎ কোষ তৈরী হতেও পারে। কিন্তু একটি অবস্থার পরে, তাও আর সম্ভব হয় না—যকৃৎ তথা যকৃতের মালিকের মৃত্যু ঘন্টা উচ্চ নিনাদে বাজতে থাকে।

সিরোসিস কখনো কখনো কোন লক্ষণ ছাড়াই চুপচাপ থাকতে পারে। সিরোসিস হয় পুরুষদেরই বেশি—তার প্রধান কারণ মহিলাদের মধ্যে মদের নেশা তুলনামূলক ভাবে কম। তবে বর্তমানে পাশ্চাত্যের বহু দেশে মহিলারাও একই ভাবে সুরাসক্ত হয়ে পড়ায়, এ ছবি আস্তে আস্তে পাল্টে যাচ্ছে। সিরোসিস যেহেতু মদ খাওয়ার ভয়াবহ পরিণতির শেষের দিকের অবস্থা, তাই সাধারণত ৩০-৪০ বছর বয়সে, এমনকি ৫০ বছর বয়সেও দেখা দিতে পারে। ১০ বছর ধরে মাত্রাতিরিক্ত এমনকি নিয়মিত মাঝারি পরিমাণে, মদ খেয়ে গেলেও ধীরে ধীরে যকৃতের অক্ষমতা ও সিরোসিস জনিত নানা লক্ষণ প্রকাশ পাবেই—এটি প্রায় সুনিশ্চিত ভাবে বলা যায়। তবে প্রোটিন-ভিটামিন তথা পুষ্টির অভাবে গরীব মানুষদের মধ্যে এবং অ্যালকোহলের প্রতি সংবেদনশীল বিশেষ কারো কারোর ক্ষেত্রে এটি আরো অনেক তাড়াতাড়ি দেখা দিতে পারে। মদ্যপরা দু'একবার ভাইরাসজনিত যকৃৎ-প্রদাহে আক্রান্ত হলেও এ সময়কাল কমে যায়।

সিরোসিসের কারণে প্রায়শঃই ক্রমবর্ধমান দুর্বলতা ও ক্লান্তি দেখা দেয়। ক্ষিদে কমে যায়, ওজন কিছুটা কমে, জন্ডিসও হতে পাড়ে। মাংসপেশী শুকোতে পারে, তার জোরও কমে যায়, পেটে জল জমে (উদরী বা ascites) পেট ফুলে যায়।

যকৃৎ কোষের কর্মক্ষমতা কমায় যকৃতে হরমোনের স্বাভাবিক বিপাকীয় ক্রিয়া কমে যায়। ফলে শরীরে স্ত্রী হরমোন ইস্ট্রোজেন ও হাইড্রোকর্টিসোন হরমোনের পরিমাণ বেড়ে যায়। এর ফলে ছেলেদের স্তনস্ফীতি (gynaecomastia), অন্ডকোষের সংকোচন ইত্যাদি দেখা দেয়। লিঙ্গের দুর্বল উত্থানও ঘটে (impotence)। এটি অবশ্য অনেক আগে থেকেই শুরু হতে পারে, সিরোসিস না থাকলেও—মস্তিষ্কে মদের অন্যতম প্রভাব এটি। মেয়েদের ক্ষেত্রে মাসিক অনিয়মিত হয়, এমনকি বন্ধও হয়ে যেতে পারে।

রক্তে ইস্ট্রোজেনের ও যথাসম্ভব আরো কিছু ক্ষতিকর পদার্থের অতিরিক্ত পরিমাণের জন্য ছোট রক্তবহা নালিকার প্রসারণ ঘটে। এর ফলে গলায়, হাতে, গায়ে, মাকড়সার জালের মত লাল দাগ দেখা দেয় (spider naevi)। এর কেন্দ্রে থাকে ছোট্ট উঁচু লাল দাগ, তার চারপাশ থেকে বেরোয় সরু সরু সুতোর মত লাল রেখা। হাতের ও পায়ের পাতায় রক্তবহা নালিকার প্রসারণের কারণে তা রক্তবর্ণ ধারণ করে (liver palm ও liver sole)। এছাড়া নখে সাদা সাদা দাগ দেখা দেয় (leuconychia) —তবে যথাসম্ভব এর সাথে ইস্ট্রোজেনের কোন সম্পর্ক নেই। সিরোসিসের রোগীর রক্তে প্রোটিনের পরিমাণও বেশ কমে যায়—এর জন্য নখে আড়াআড়ি কিছু রেখার সৃষ্টি হয় (Mercke's bands)।

কখনো কখনো আবার গায়ের লোম পড়ে যায় বা পাতলা হয়ে যায়, মুখের প্যারোটিড লালাগ্রন্থির স্ফীতি ঘটে। চামড়াও লালচে রঙ ধারণ করে—এটি ফর্সা মানুষের ক্ষেত্রেই স্পষ্ট বোঝা যায়। হাতের তালুর মধ্যে বিশেষ তন্তুজাতীয় কলা (palmer fascia) সংকুচিত হয়ে দু'চারটি আঙ্গুল স্থায়ীভাবে বেঁকে যেতে পারে (Dupuytren's contracture)— এটি মদ্যপায়ীদের মধ্যে প্রায়ই দেখা যায়, যদিও সিরোসিসের অবশ্যম্ভাবী লক্ষণ এটি নয়।

সিরোসিসের রোগী মাঝে মাঝেই জ্বরে ভোগে ও যকৃৎ সহ শরীরের নানা অংশ নানা রোগজীবাণু দিয়ে আক্রান্ত হয়। শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাওয়ার কারণে এটি ঘটে। এর ফলে অন্যান্য ভয়াবহরোগ যেমন হতে পারে তেমনি বারবার হওয়া যকৃতের প্রদাহের কারণে সিরোসিসও আরো বেড়ে যায়।

সিরোসিস হলে যকৃতের ভেতরে পোর্টাল শিরার শাখা-প্রশাখা বেঁকে চুরে

যায় ও তাদের উপর চাপ পড়ে (portal hypertension)। পোর্টাল শিরা পাকস্থলী, অন্ত্র, প্লীহা ইত্যাদি থেকে রক্ত যকৃতে বয়ে আনে। পাকস্থলী ও অন্ত্র থেকে আনা রক্তে থাকে হজমের ফলে তৈরি হওয়া সরল খাদ্য অণু। এগুলি যকৃতের মধ্যে বিপাকীয় ক্রিয়ায় শরীরের পক্ষে উপযোগী হয়ে ওঠে, তারপর রক্তের মাধ্যমে, হেপাটিক শিরা মারফৎ হৃদপিণ্ডে পেঁছয় ; হৃদপিণ্ড সেই রক্ত পাম্প করে সারা শরীরে পেঁছে দেয়। পোর্টাল শিরায় রক্তচাপ প্রচণ্ড বেড়ে গেলে নানা স্থানে রক্ত বহা শিরার স্ফীতি ঘটে। এই স্ফীতির প্রধান জায়গাগুলি হল পাকস্থলী ও খাদ্যনালীর সংযোগ স্থলে(esophageal varices), মলাশয়ে ও নাভির চারপাশে। এর মধ্যে প্রথমটিই সবচেয়ে মারাত্মক, সামান্য কারণে এটি ফেটে প্রচুর রক্তপাত তথা রক্তবমি শুরু হয় ; কিছু রক্ত মুখ দিয়ে না বেরিয়ে আলকাতরার মত কালো পায়খানা (melaena ; যে কালো রঙ আসলে রক্তের পরিবর্তিত রূপের জন্যই) হতে পারে। আর অন্ত্রের মধ্যে এই রক্ত থেকে তৈরি হয় এ্যামোনিয়া ও অন্যান্য নাইট্রোজেন যুক্ত দূষিত পদার্থ। কিন্তু এগুলিকে অকর্মণ্য যকৃত নির্বিষকরণ করতে পারে না এবং রক্ত মারফৎ চলে যায় মস্তিষ্কে। এর থেকে রোগী জ্ঞান হারিয়ে (hepatic coma) মারা পড়ে প্রায়ই। মদ্যপান জনিত যকৃতের সিরোসিসে যত জনের মৃত্যু হয় তাদের তিন ভাগের একভাগই মারা পড়ে এভাবে। আর মোট সংখ্যার অর্ধেকের মৃত্যুর কারণ কোন না কোনভাবে হেপাটিক কোমা (যেমন জণ্ডিস হয়ে ইত্যাদি)। ১৯৩৯-৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়, প্যারিসে যখন মদের উপর নিয়ন্ত্রণ জারী করা হয়, তখন সিরোসিস জনিত মৃত্যুহার শতকরা ৮৪ ভাগ কমে গেছিল। নিয়ন্ত্রণ উঠে যেতে পাঁচ বছর পরে আবার আগের অবস্থা ফিরে আসে।

খাদ্যনালীর অংশ ছাড়া মলাশয়ে স্ফীত শিরা ফেটেও অর্শের মত রক্তপাত হতে পারে। কোষ্ঠবদ্ধতা বা সামান্য কোন ধরনের আঘাত থেকে এটি হামেশাই ঘটে।

মদ্যপানের ফলে যকৃতের অপরিবর্তনীয় সিরোসিস হওয়ার কারণে যেগুলি ঘটে তাদের মূলতঃ তিনভাগে ভাগ করা যায়—

(১) পোর্টাল শিরায় রক্তচাপ বৃদ্ধি (portal hypertension)

(২) যকৃৎ কোষের কর্মক্ষমতার হ্রাস

(৩) জণ্ডিস

প্রথমটির জন্য কিভাবে রক্তবমি হতে পারে তা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। পেটে জল জমা বা উদরী (ascites) হওয়ার পেছনেও এটির ভূমিকা রয়েছে। অবশ্যি কিভাবে এটি ঘটে তা সম্পূর্ণ পরিষ্কার নয়। দেখা গেছে সিরোসিস না হয়ে যকৃতের বাইরের অন্য কোন কারণে (যেমন কোন টিউমারের চাপ পড়ে) যদি পোর্টাল শিরায় রক্ত চাপ বেড়ে যায় তবে প্রায়ই উদরী হয় না। অন্যদিকে সিরোসিস-এর রোগীর পোর্টাল শিরায় অস্ত্রোপচার করে চাপ কমালে উদরী কমে যায়। তাই সব মিলিয়ে সিরোসিসে অন্যান্য ঘটনার সাথে পোর্টাল শিরায় রক্ত চাপ বৃদ্ধি উদরী সৃষ্টিতে কিছু ভূমিকা রাখে বলেই বলা হয়।

পোর্টাল শিরায় রক্তচাপ বেড়ে যাওয়ায় অন্ত্র তথা অন্ত্রাদির আবরণ বা পেরিটোনিয়ামের গায়ের রক্তবহা নালিকায়ও চাপ বেড়ে যায়। এ কারণে ঐসব অঞ্চল থেকে কোষরসও ঠিকমত রক্তবাহিত হতে পারে না। সব মিলিয়ে পেরিটোনিয়ামের গহ্বরে চুঁইয়ে চুঁইয়ে জমা হয় কোষরস ও রক্তরস। এটিই উদরী। একই ভাবে এসব অঞ্চলের লসিকা রস (lymph)-ও ঠিকভাবে যকৃতে যেতে পারে না—তাও জমে পেরিটোনিয়ামের গহ্বরে। তবে এই লসিকারস মূলত আসে সিরোসিস হওয়া যকৃতের গা থেকে।

সিরোসিসে উদরী হওয়ার পেছনে অন্যান্য কিছু ব্যাপারও জড়িয়ে থাকে। যকৃৎ যেহেতু রক্তের প্রোটিন তৈরি করে, তাই যকৃৎকোষের কর্মক্ষমতা কমায় রক্তে বিশেষত অ্যালবুমিনের অভাব ঘটে। যকৃতে প্রোটিনের স্বাভাবিক বিপাকীয় ক্রিয়া বিপর্যস্ত হওয়াও এতে ভূমিকা পালন করে। অন্য দিকে অ্যালবুমিনের অভাবে রক্তের জলীয় অংশ ধরে রাখার ক্ষমতাও কমে যায় (decreased plasma colloid osmotic pressure)। এ কারণেও পেরিটোনিয়ামের মধ্যে রক্ত রস চুইয়ে পড়ে অর্থাৎ উদরীর সৃষ্টি হয়। দেখা গেছে পুরো শরীরে যা অ্যালবুমিন থাকে তার এক চতুর্থাংশ পরিমাণই উদরীর জলীয় অংশে থাকতে পারে। এর ফলে রক্তে অ্যালবুমিনের পরিমাণ আরো কমতে থাকে এবং প্রক্রিয়াটি চক্রবৃদ্ধিহারে বেড়ে চলে। রক্তে প্রোটিনের অভাবের কারণে অবশ্য শুধু পেরিটোনিয়ামে নয়, সারা শরীরেই আন্তর্কোষীয় অঞ্চলে ও কলা-য় জল জমে—সারা শরীর ফুলে যায়, বেশি হয় শরীরের নীচের দিকে তথা পায়ে ও বহির্যৌনাঙ্গে। এ অবস্থাকে শোথ (anasarca) বলা হয়। এ ছাড়া যকৃতের সিরোসিসের জন্য

এ্যালডোস্টেরন নামক হরমোনের পরিমাণ বেড়ে যাওয়াও (hyperaldosteronism) উদরী সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখে। যকৃৎ কোষে এ্যালডোস্টেরন হরমোনের বিপাকীয় ক্রিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হয়, কিডনীতে রক্ত সরবরাহ কমার কারণে এ্যাড্রেনাল গ্ল্যান্ড এই হরমোন আরো বেশি করে ক্ষরণও করে। সব মিলিয়ে এর পরিমাণ বাড়ে এবং এর ফলে কিডনী থেকে (distal tubule) সোডিয়াম বেশি পরিমাণে পুনর্শোষিত হয়। অনেক রোগীর ক্ষেত্রে জলের অস্বাভাবিক রেচন প্রক্রিয়াও (impaired water excretion) উদরী সৃষ্টিতে জড়িত থাকে। কিডনীতে রক্ত সরবরাহ কমে যাওয়া ও কারো কারোর ক্ষেত্রে এ্যান্টিডাইয়ুরেটিক হরমোনের পরিমাণ বেড়ে যাওয়ার জন্য এই অস্বাভাবিকত্ব ঘটে।

যকৃৎ কোষের কর্মক্ষমতা কমে যাওয়ার ফলে প্রোটিনের তৈরি ও বিপাকীয় ক্রিয়া বিপর্যস্ত হওয়ার কারণে এ্যানিমিয়া বা রক্তহীনতাও হয়। রক্তের লোহিত কণিকার হিমোগ্লোবিন-এর প্রোটিন অংশ অর্থাৎ গ্লোবিন যথেষ্ট পরিমাণে তৈরি না হওয়ার জন্য এটি ঘটে। এছাড়া অ্যালকোহল জনিত অনেক সিরোসিসের রোগীই প্রচণ্ড ক্ষুধামন্দ্যে ভোগে ; ফলে স্বাভাবিক খাবার দাবারের পরিমাণ কমে যায়। এ কারণেও অপুষ্টি ও প্রোটিনের অভাব ও লৌহ ঘটিত লবণ যুক্ত পদার্থের অভাব ঘটে, যা রক্তহীনতা সৃষ্টি করে। অ্যালকোহল থেকে কিছু পরিমাণ ক্যালরি পাওয়ার ফলে অন্য খাদ্যের প্রয়োজনও কমে যায়। আর অ্যালকোহলের যে কোন পুষ্টি ক্ষমতা নেই তা জানাই রয়েছে। একইভাবে ঘাটতি ঘটে ফোলিক এ্যাসিডের যার ফলেও এ্যানিমিয়া হয়। সিরোসিস থেকে পোর্টাল শিরায় রক্ত চাপ বৃদ্ধি—তার থেকে রক্তবমি, কালো পায়খানা ইত্যাদির ফলে শরীর থেকে অস্বাভাবিক পরিমাণে রক্ত বেরিয়ে যাওয়ার কারণেও রক্তহীনতা সৃষ্টি হয়। দ্রুত সৃষ্টি হওয়া ফ্যাটি লিভার (acute fatty liver)-এ লোহিত কণিকা ভেঙে যাওয়ার হারও অনেক বেড়ে যায়। এটিও রক্তহীনতা সৃষ্টিতে অনেক সময় ভূমিকা রাখে।

যকৃৎ কোষের ক্ষমতা কমে যাওয়ার জন্য নানা হরমোনের, বিশেষত যৌন হরমোনের বিপাকীয় ক্রিয়া কমে যাওয়ার ফলে যে সব অস্বাভাবিকত্ব হয় তা আগে বলা হয়েছে। পুরো শরীরের উপরই এই সব হরমোনের অস্বাভাবিক পরিমাণের ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে।

মদ্যপান তথা সিরোসিস-এর কারণে জণ্ডিসও একটি ভয়াবহ লক্ষণ। যকৃতে তৈরী হয় পিত্ত (bile)। এই পিত্তে থাকে বিলিরুবিন নামে হলুদাভ রঞ্জক পদার্থ। রক্তের লোহিত কণিকার হিমোগ্লোবিন ভেঙে তৈরী হয় এই বিলিরুবিন। এটিকে বলা হয় অসংযুক্ত (unconjugated) বিলিরুবিন। এটি যকৃৎ কোষে গিয়ে গ্লুকুরোনিক বা গ্লাইকুরোনিক এ্যাসিডের সাথে যুক্ত হয়ে সংযুক্ত (conjugated) বিলিরুবিন সৃষ্টি করে। সিরোসিসে যকৃতের অভ্যন্তরীণ স্বাভাবিক আকার বিকৃত হয়, পিত্তনালিকা বেঁকেচুরে যায় ও তাদের উপর চাপ পড়ে। একারণে পিত্ত তার স্বাভাবিক পথ অর্থাৎ পিত্তনালী বেয়ে পিত্তথলী ও তার থেকে অন্ত্রে সম্পূর্ণ আসতে পারে না—ফলে যকৃতের অভ্যন্তরীণ পিত্ত নালিকা থেকে বিলিরুবিন রক্তে চলে আসে, রক্তে জমা হয় সংযুক্ত বিলিরুবিন। অন্য দিকে যকৃৎ কোষের কাজ কমে যাওয়ার ফলে রক্তের অসংযুক্ত বিলিরুবিনও যকৃতে পুরো যেতে বা পরিবর্তিত না পেরে রক্তে জমা হতে থাকে। সব মিলিয়ে রক্তে দু'ধরনের বিলিরুবিনই জমা হয়। এর ফলে সৃষ্টি হয় জণ্ডিস, যার ফলে চোখের সাদা অংশ, নখ, তালু, জিভের তলা, গায়ের চামড়া, মূত্র—এগুলি হলুদ রঙের হয়ে যায়। রক্তে স্বাভাবিক ভাবে বিলিরুবিনের পরিমাণ ০·৫—০·৮ ইউনিট (এক ইউনিট=Serum বা রক্ত রসের ২০০০০০ মি. লি.-এ ১ মি.গ্রা. বিলিরুবিন) বা ০·২৫—০·৪ মাইক্রোগ্রাম প্রতি ১০০ মি.লি.-এ। সিরোসিসের রোগীদের ক্ষত্রে এই পরিমাণ বেড়ে প্রতি ১০০ মি. লি.-এ ৫০০০০ মাইক্রোগ্রাম, এমন কি বিরল ক্ষেত্রে ৯০০০০—৯৫০০০ মাইক্রোগ্রাম হয়ে যেতে পারে। বিলিরুবিনের এই উচ্চমাত্রা মস্তিষ্কে চরম ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। রোগীর অজ্ঞান (hepatic coma) হয়ে যাওয়া থেকে মস্তিষ্কের স্থায়ী ক্ষতি ও মৃত্যু পর্যন্ত ঘটাতে পারে।

এভাবে মৃত্যু না হলেও সিরোসিসের অন্যান্য পার্শ্ব প্রভাবের কারণে মৃত্যু ত্বরান্বিত হয়। সিরোসিসের কারণে প্রায়ই ৩—৫ বছরের মধ্যে মৃত্যু ঘটে। রোগী ক্রমশঃ দুর্বল হতে থাকে, শরীর শুকিয়ে যায়, দীর্ঘস্থায়ী জণ্ডিস, তীব্র জীবাণু আক্রমণ ইত্যাদি ঘটে। এ সব রোগীর পেপটিক আলসার ও মারাত্মক অগ্ন্যাশয় প্রদাহের সম্ভাবনা অনেক অনেক বেশী। শরীরের স্বাভাবিক প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাওয়ার কারণে অনেকের ক্ষেত্রে যক্ষ্মার জীবাণুর মত সাংঘাতিক জীবাণু দ্বারা রক্ত দূষণ, জীবাণু

জনিত অন্ত্রাবরণী অর্থাৎ পেরিটোনিয়ামের তীব্র প্রদাহ ও যকৃতের ক্যান্সারের মত অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে—যে সব থেকে দ্রুত মৃত্যু প্রায় অবধারিত।

যকৃতের সিরোসিসের অন্যতম আরেকটি ভয়াবহ পার্শ্বপ্রভাব হচ্ছে বৃক্ক বা কিডনীর উপর (hepato renal syndrome)। পেটের ভেতরে রক্ত ক্ষরণ হলে বা পেটে জল জমা, গা-হাত-পা ফোলা ইত্যাদির চিকিৎসার উদ্দেশ্যে বেশি মাত্রায় মূত্রবর্ধক ওষুধ দিয়ে দিলে কিংবা অতি দ্রুত পেটে জমা জল বের করে ফেললে এটি ঘটতে পারে। অবশ্য অনেক সময় এ ধরনের কোন কারণই জানা যায় না। প্রস্রাবের পরিমাণ কমে সারা দিনে মাত্র ২০০—৪০০ মিলিলিটারে দাঁড়ায় (স্বাভাবিক পরিমাণ দিনে প্রায় দেড় লিটার)। কিডনীর কাজ প্রচন্ড ভাবে কমে যায়। রক্তে ইউরিয়ার পরিমাণ বাড়তে থাকে ; এর ফলেও অথবা পরিপাক তন্ত্রের ভেতরে রক্ত ক্ষরণ হ'য়ে ও জ্ঞান হারিয়ে (hypatic coma) রোগীর মৃত্যু ঘটতে পারে। প্রায় সব ক্ষেত্রেই চিকিৎসার সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়। তবু নুন ছাড়া প্রোটিন (salt-poor albumin), লবন ও জলের নিয়ন্ত্রণ--এ সব চেষ্টা করা যায়। সবচেয়ে বড় কথা যকৃতের কাজের উন্নতি ঘটান। কিন্তু তা ওষুধ দিয়ে সম্ভব নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে যকৃৎ পাল্টে (liver transplantation) দিলে অথবা অস্ত্রোপচার করে যকৃতের রক্ত বহা নালীর গতিপথ পরিবর্তন করা (portacaval shunt) হলে উপকার পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু সিরোসিসের রোগীর ক্ষেত্রে যেমন, তেমনি এ ক্ষেত্রেও রোগীর সামগ্রিক অবস্থা এত খারাপ থাকে যে, কোন অস্ত্রোপচার করাটাই আরো বিপজ্জনক এবং মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করা ছাড়া তার আর কোন ভূমিকা প্রায় থাকে না।

মদ্যপানজনিত যকৃতের সিরোসিস ও তার কারণে পেটে জল জমার আরেক ভয়াবহ পরিণতি হল অন্ত্রাবরণীর তীব্র জীবাণু সংক্রমণ (acute bacterial peritonitis)। এ জীবাণু কোত্থেকে আসে তা সঠিক বলা মুশকিল ; হয়তো বা রক্ত দূষণ (septicaemia) থেকে কিংবা অন্ত্রের দেওয়ালে কোন ফুটো হয়ে। হঠাৎ জ্বর, পুরো পেট জুড়ে ব্যথা ও কাঁপুনি হয় ; পেট থেকে 'জল' বের করালে তা পুঁজের মত ঘোলাটে হয় এবং তাতে শ্বেত কণিকা থাকে প্রতি ঘন মিলিমিটারে ৩০০-এরও বেশী, যার ৭৫% এরও বেশীর ভাগ হয় পলিমরফ্। এই 'জল'-এর কালচার-সেন্সিটিভিটি

টেষ্ট করে ও সংশ্লিষ্ট জীবাণুর জন্য ওষুধ জেনে নিয়ে চিকিৎসা করা যায়। কিন্তু এসব করতে গেলে কিছু সময় যায়, তাই রোগটি সন্দেহ হওয়ামাত্র জরুরী ভিত্তিতেই এ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে চিকিৎসা শুরু করা দরকার। তবু মৃত্যুহার অনেক, অনেক বেশি।

সিরোসিস বা মদ্যপানজনিত যকৃতের সামান্য পরিবর্তন সন্দেহ হওয়ামাত্র মদ্যপান চিরতরে সম্পূর্ণ বন্ধ করা উচিত। এটিই চিকিৎসার প্রধানতম দিক। সাথে যথেষ্ট প্রোটিন, ক্যালরি ও ভিটামিন, বিশেষত ভিটামিন বি-কমপ্লেক্স দেওয়া দরকার। বয়স্কদের জন্য ২৫০০ ক্যালরির বেশী শক্তি দেওয়া উচিত। অন্তত এক কাপ দুধ, ১০০ গ্রাম মাংস বা ডিম-এর সাথে যথেষ্ট পরিমাণে ভাত বা রুটি, মাখন, ফলমূল, মিষ্টি ইত্যাদি দেওয়া উচিত। অবশ্যি আমাদের দেশের গরীব মানুষদের পক্ষে এ ধরনের খাবার জোগাড় করা মুশকিল। সেক্ষেত্রে ডাল, ভাত, আনাজপত্র, শাকসব্জি, বিশেষ ঋতুর ফলমূল, ছোলার ছাতু, রেপসীড তেল, আখের গুড় ইত্যাদির উপরজোর দেওয়া যায়। সাথে আলাদাভাবে কিছু ভিটামিন দিতে পারলে ভাল। প্রকৃতপক্ষে সিরোসিসের অন্য কোন চিকিৎসা নেই এবং এসব যাই করা হোক না কেন, আবার মদ খেলে, এমনকি অল্প পরিমাণেও—**তা সে টনিক, পান্তা ভাত যেভাবেই হোক না কেন**—তাতে ক্ষতি আরো দ্রুত, আরো বেশি হয়। আর সিরোসিসের অন্যান্য আনুষঙ্গিক লক্ষণ ও কষ্টের জন্য চিকিৎসকের অধীনে থেকে চিকিৎসা করা যায়, যেমন পেটে জল জমলে ও গা-হাত ফুলে গেলে নুন কম খাইয়ে, মূত্রবর্ধক ওষুধ দেওয়া, মাঝে মাঝে পেট থেকে নিয়ন্ত্রিত পরিমাণে জল বের করানো ইত্যাদি। জ্বর তথা জীবাণু সংক্রমণ হলে জীবাণু ধ্বংসকারী এ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া যায়।

বাজার চলতি বহু তথাকথিত লিভার টনিক নানা কিছু মিশিয়ে দাবী করে যে সেগুলি যকৃতের কাজকে উন্নত করবে এবং বিজ্ঞাপনে এমনও দাবী করে যে অ্যালকোহল খেয়ে যকৃতের যে ক্ষতি হয় ঐসব লিভার টনিক সে ক্ষতিও সামাল দিতে তথা যকৃতকে রক্ষা করতে পারে (যেমন "alcohol harms, Liv-52 protects")। কথাগুলি নির্ভেজাল মিথ্যা। এসব টনিকে থাকে নানা গাছগাছড়ার রস, নানা হজমের জিনিস ও হাবিজাবি রাসায়নিক পদার্থ। এগুলির কোনটিই যকৃতের কাজকে উন্নত করে বা মদ্যপানজনিত যকৃতের সম্ভাব্য ক্ষতিকে প্রতিরোধ করে, এরকম বিন্দুমাত্র বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নেই।

অন্যদিকে নানা গাছগাছড়ার নির্যাসই অ্যালকোহলের দ্রবণের মাধ্যমে নিষ্কাশিত করা হয় এবং এই ধরনের কোন কোন তথাকথিত লিভার টনিকে অ্যালকোহলও থাকে। সেটি উল্টে যকৃতের আরো ক্ষতি করে। তাই যদি কোন সুরাপায়ী আশা করে যে সুরার সাথে এসব লিভার-টনিক খেয়ে যকৃৎকে বাঁচানো যাবে, তবে ঐ মিথ্যে আশার কারণে সে আরো বিপদই ডেকে আনবে—আপাত নিশ্চিন্ত থাকার কারণে মদ্যপানে কোন নিয়ন্ত্রণও থাকবে না ; যকৃৎ তথা সমগ্র শরীর সর্বনাশের পথে দ্রুত এগিয়ে চলবে। বিজ্ঞাপনের বহর দেখে মদ্য ব্যবসায়ীদের সঙ্গে এ সব পণ্যের ব্যবসায়ীদের যোগাযোগের ব্যাপারেও সন্দেহ হয়। অথবা উভয়েই হয়তো এই শোষণজীবী ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অংশ।

হৃদপিণ্ড ও রক্ত সঞ্চালন

আগে এ সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা হয়েছে। অ্যালকোহল সরাসরি হৃদপিণ্ডের মাংসপেশীর উত্তেজনা প্রবণতা ও সংকোচন ক্ষমতাকে প্রভাবিত করে। মদ্যদূষণের ফলে নাড়ী দ্রুত হয়, রক্তচাপ বাড়ে (systolic pressure), চামড়ার রক্তবহা নালিকার প্রসারণ ঘটে, ঘাম হতে থাকে, শরীর ঠাণ্ডা হয়ে যায় ও হৃদপিণ্ডকে স্বাভাবিকের তুলনায় বেশী পরিমাণে রক্ত পাঠাতে অর্থাৎ বেশি কাজ করতে হয়। কোন কোন গবেষক দেখেছেন মদের কারণে এ ধরনের প্রভাব **পাশ্চাত্যের তুলনায় প্রাচ্যের লোকেদের মধ্যে বেশি দেখা দেয়**। ভারতবর্ষের মত প্রাচ্যের দেশগুলিতে মদ্যপানের প্রচলন তুলনামূলকভাবে কম থাকার পেছনে এটি যথাসম্ভব একটি কারণ। নিয়মিত মদ্যপান তথা বারবার মদ্য দূষণ ঘটতে থাকলে হৃদপিন্ডের উপর বেশি চাপ পড়ার কারণে তার মাংসপেশী স্থায়ীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, স্থায়ী উচ্চরক্ত চাপের সৃষ্টি হয় এবং এসব না থাকলেও, অতিরিক্ত মদ্য পানের কারণে নিলয়ের অস্বাভাবিক অতিদ্রুত কম্পন (atrial fibrillation) হঠাৎ শুরু হতে পারে। তবে খুব অল্প পরিমাণে নিয়মিত মদ খেলে হার্ট এ্যাটাক ও স্ট্রোক হওয়ার সম্ভাবনা কমে বলে অনেক সমীক্ষক দেখেছেন। কিন্তু এটি মদ্যপানের স্বপক্ষে কোন যুক্তি নয় ; যারা মদ খায় তারা এত

অল্পে সন্তুষ্ট হয় না—কারণ এতে নেশা হয় না এবং মদ্যপানের অন্যান্য ভয়াবহ, প্রাণঘাতী শারীরিক ও সর্বনাশা সামাজিক প্রতিক্রিয়া রয়েইছে।

মদের জন্য রক্তবহা নালিকার প্রসারণের কারণেই মদ খাওয়ার পরে গরম বোধ হয়। এই প্রসারণ ঘটে, মস্তিষ্কের সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রের (vasomotor centre)-এর নিস্তেজনার কারণে। এর ফলেই শীতপ্রধান অঞ্চলে কিছু পরিমাণ মদ্যপান স্বাভাবিক অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। তবে অন্যদিকে প্রসারিত রক্তবহা নালিকার কারণে শরীরের তাপও বেরিয়ে যায়, এর ফলে মদ খেয়ে খুব ঠাণ্ডায় বেরোন অত্যন্ত বিপজ্জনক, সহজে শরীর হিমশীতল হয়ে যায় এবং শরীর 'কল্যাপস্' করে মৃত্যুও ঘটতে পারে। শীতপ্রধান দেশে মধ্য রাত্রে পার্টি ইত্যাদিতে প্রচুর মদ খেয়ে বাইরে বেরোলে গাড়ী চালাতে চালাতে বা বাড়ীর বাইরের রাস্তাতেই কল্যাপস্ করে মারা যাওয়ার ঘটনা বিরল নয়। অন্যদিকে স্বাভাবিক কারণেই মদ খেয়ে ঠাণ্ডা জায়গা থেকে গরমে এলে কিছুটা আরাম লাগে। তবে অ্যালকোহল হৃৎপিণ্ডের রক্তবহা নালির প্রসারণ ঘটায় না, যদিও হার্ট এ্যাটাকের ব্যথা কিছুটা কমাতে পারে।এই ব্যথা কমার ব্যাপারটি ঘটে মস্তিষ্কে এর নিস্তেজক (depressant) ও অবেদক (analgesic ও hypnotic) প্রভাবের জন্য। তাই হার্ট এ্যাটাক বা এ্যানজাইনা পেকটোরিসের ব্যথা মদ্যপানে সামান্য কমলেও মদ্যপান তার আসল চিকিৎসা তো নয়ই—বরং অত্যন্ত বিপজ্জনক, কারণ, মূল রোগটি থেকেই যায় এবং ব্যথা কিছুটা কমার জন্য আসল চিকিৎসাও বিলম্বিত হয়।

রক্ত তৈরির উপর প্রভাব—আমাদের শরীরে হাড়ের মজ্জার কোষ থেকে অতি প্রয়োজনীয় রক্ত কণিকা তৈরী হয়। মদ সরাসরি এই মজ্জাকোষকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। এর ফলে রক্তহীনতা যেমন হয়, তেমনি শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতাও কমে যায়, সহজে জীবাণু আক্রমণ ঘটতে পারে, এবং অণুচক্রিকা অর্থাৎ প্ল্যাটেলেটের সংখ্যা কমে গিয়ে অতিরিক্ত রক্তপাতের প্রবণতাও বাড়ে। পরীক্ষামূলক ভাবে মদ খাইয়ে দেখা গেছে এর ফলে রক্তের লোহিত ও শ্বেত কণিকার পূর্বসূরী জনক কোষের মধ্যে ফাঁকা অংশ (vacuoles) বৃদ্ধি পায়, অণুচক্রিকার সংখ্যাও কমে যায়। এদের সবার ক্ষেত্রেই প্রয়োজনীয় ভিটামিনের (ফোলিক এ্যাসিড) জোগান ও পুষ্টি ঠিক রাখা সত্ত্বেও এসব ঘটেছে। এমনকি মদ বন্ধ করার সময়ে রক্তাল্পতা তথা লৌহঘটিত

লবণের অভাবও দেখা গেছে। তবু সাধারণতঃ এসব বিষক্রিয়া খুব সাংঘাতিক হয় না, হলে অতি সহজেই সব সুরাসক্তের দ্রুত মৃত্যু ঘটত।

আর মজ্জাকোষের উপর প্রভাব ছাড়া, যকৃতের উপর প্রভাবে কিভাবে রক্তহীনতা হয়, রক্ত ক্ষরণের প্রবণতা বাড়ে—এসব আগেই বলা হয়েছে।

পরিপাক তন্ত্র

অল্প পরিমাণে বীয়ারের মত পাৎলা মদ খেলেও সেটি পাকস্থলীর অভ্যন্তরীণ আবরণীর অ্যাসিড সৃষ্টিকারী কোষ সমূহকে (parietal cells) উত্তেজিত করে। এমন কি মুখে না খেয়ে অন্য কোন পথে অ্যালকোহল শরীরে প্রয়োগ করলেও এটি ঘটতে পারে। এর ফলে পাকস্থলীতে অ্যাসিড ক্ষরণ বৃদ্ধি পায়—এর পেছনে মদের কারণে গ্যাস্ট্রিন ও হিস্টামিন নামক পদার্থের নিঃসরণও ভূমিকা পালন করে। অন্যদিকে, আরেকটু কড়া অর্থাৎ শতকরা ১০-১৫ ভাগের বেশী ইথাইল অ্যালকোহল যুক্ত মদ খেলে পাকস্থলীর অভ্যন্তরীণ আবরণীতে রক্ত সঞ্চালন বাড়ে ও অ্যাসিড ক্ষরণ কমে যায়; সৃষ্টি হয় পাকস্থলীর প্রদাহ (gastritis)। তবে মদ বন্ধ হলেই এটি দ্রুত স্বাভাবিক হতে পারে। মদ খাওয়ার পরে প্রায়ই কৃত্রিমভাবে খিদে বাড়ে, কারণ মদ স্বাদ গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কোষগুলিকে উত্তেজিত করে ও মদের জন্য একটি আপাত ভাল লাগার অবস্থা সৃষ্টি হয়। আগেই বলা হয়েছে, এই আপাত ভাল লাগা বা ক্লান্তি কম মনে হওয়ার পেছনে অনুভব করার ক্ষমতা কমে যাওয়াটাই প্রধান, মাংসপেশীর উত্তেজনা বা ক্ষমতাবৃদ্ধি নয়।

মদ্যপদের মধ্যে পেটের নানা গণ্ডগোল অতি সাধারণ একটি ব্যাপার। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল সকালে উঠে বমি ও বমি বমিভাব। রোগী কিছু পরিমাণ মদ খেয়ে নিলে এটি কমে যায়, ফলে আরো বেশি মদ সে খেয়ে নিতে পারে কোন অসুবিধা ছাড়াই। অসুবিধা দেখা দেয় আবার পরের দিন সকালে। এইভাবেই সে নিয়মিত এগিয়ে চলতে থাকে সর্বনাশের পথে। (withdrawal syndrome অংশ দ্রষ্টব্য।)

মদ্যপদের মধ্যে পেপটিক আলসার-এর সম্ভাবনা অত্যন্ত বেশি।

আলসার হওয়ার আগে নিয়মিত পেট ফাঁপা, ওপর পেটে অস্বস্তি, ঢেকুর, এমন কি রক্ত বমি হতে পারে। এসবের পেছনে প্রাথমিক কারণ পাকস্থলীর প্রদাহ। দু-চারদিন মদ খাওয়ার পর মদ খাওয়া সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিলে কয়েকদিনের মধ্যে প্রায়শঃ এটি সম্পূর্ণ ঠিক হয়ে যায়। কিন্তু তা না হলে বা প্রদাহ বেশি হলে পাকস্থলীর অভ্যন্তরীণ আবরণীতে ক্ষত সৃষ্টি হতে পারে, এর থেকেই রক্তপাত হয়। এ ছাড়া খাদ্যনালী ও পাকস্থলীর সংযোগস্থলের আবরণী ছিঁড়ে গিয়েও প্রচণ্ড রক্তপাত তথা রক্তবমি হতে পারে (Mallory-Weiss Syndrome)। সাধারণতঃ এটি হওয়ার আগে জোরে বমি হয় বা বারংবার হেঁচকি ওঠে।

অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে প্রায়শঃই অগ্ন্যাশয়ের প্রদাহ (pancreatitis) হতে পারে। কখনো কখনো এটি মৃদুভাবে পাকস্থলীর প্রদাহের একই সঙ্গে থাকে এবং আলাদাভাবে বোঝা যায় না। কিন্তু তীব্রতর অবস্থায় ওপর পেটে ব্যথা ও বমি হতে থাকে, পেটের মাংসপেশী শক্ত হয়ে যায়। অগ্ন্যাশয় শক্ত হয়ে আকারে বড় হয়ে যায় এবং তার গায়ে রক্ত ও পুঁজ দেখা দেয়। তীব্রতম অগ্ন্যাশয় প্রদাহে তার ভেতরে রক্তপাত ঘটে (hemorrhagic pancreatitis), কখনো বা অগ্ন্যাশয়ের নানা অংশের কোষের ক্ষয় ঘটে (necrotising pancreatitis)। হঠাৎ বেশি পরিমাণে বা দীর্ঘদিন ধরে মোটামুটি পরিমাণে মদ খেয়ে গেলেও এ সবকিছুই ঘটতে পারে। আমেরিকায় অগ্ন্যাশয়ের তীব্র প্রদাহ (acute pancreatitis)-এর প্রধানতম কারণ মদ, দ্বিতীয় কারণ পিত্তপাথুরী। ইংল্যাণ্ডে ঠিক উল্টো। অগ্ন্যাশয়ের প্রদাহ জরুরি ভিত্তিতে চিকিৎসা করা উচিত। অতি উন্নত চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকলেও আমেরিকায় অগ্ন্যাশয়ের তীব্র প্রদাহের কারণে মৃত্যুহার ক্রমবর্ধমান। ১৯৫৭ তে এক লক্ষ মানুষের মধ্যে একজনের এ কারণে মৃত্যু হয়েছে, ১৯৬৫ তে ১·৩ জনের। এটি আমেরিকানদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান সুরাসক্তির নির্দেশ করে।

তীব্র অগ্ন্যাশয় প্রদাহে অগ্ন্যাশয়ের প্রোটিন হজমকারী উৎসেচক বিশেষতঃ ট্রিপসিন, অতিমাত্রায় সক্রিয় হয়ে যায় এবং অগ্ন্যাশয়ের ও তার চারপাশের কোষের প্রোটিনকেই হজম করে ফেলে ;'এটি ইলাস্টেজ ও ফসফোলাইপেজ নামে অন্য দুটি উৎসেচককেও অতি মাত্রায় সক্রিয় করে দেয়—ফলে কোষ-আবরণও হজম হয়ে যায়। একই সঙ্গে ব্রাডিকাইনিন পেপটাইড ও

হিস্টামিনের নিঃসরণ ঘটে ও সক্রিয়তা বাড়ে—এর ফলে রক্তবহা নালিকার প্রসারণ ঘটে এবং সব মিলিয়ে অগ্ন্যাশয়ের কোষ ধ্বংস হতে থাকে, আর তার ভেতরের রক্তবহা নালিকা ছিঁড়ে রক্তপাত হয়। ওপর পেটে ও নাভির চারপাশে মৃদু বা তীব্র পেটে ব্যথা হয় ; এটি পিঠের দিকে এবং মাঝে মাঝে বুকে, পেটের দুপাশে ও তলপেটে ছড়ায়। শুয়ে থাকলে ব্যথা বাড়ে। হাঁটু মুড়ে বসে থাকলে রোগী কিছু আরাম পায়। বমি, বমিভাব, পেটফাঁপা থাকে। অল্প জ্বর, নাড়ির দ্রুত গতি, রক্তচাপ কমে-যাওয়া ও শক (shock) হতে পারে। প্রদাহের কারণে অগ্ন্যাশয়ের স্ফীতি ঘটে ও পিত্তনালীর উপর চাপ পড়ে ; ফলে জণ্ডিস দেখা দিতে পারে। বুকে জলও জমতে পারে। পেটে চাপ দিলে ব্যথা হয়, অন্ত্রের সঞ্চালনের কারণে পেটের আওয়াজ পেটে স্টেথোস্কোপ বসিয়ে শোনা যায় না বা কমে যায়। অগ্ন্যাশয় কোষের ক্ষয়জনিত তীব্র প্রদাহে পেটে রক্তও জমতে পারে, যার ফলে নাভির চারপাশে হাল্কা নীল রঙ দেখা যায় (Cullen's sign) ; লোহিত কণিকার হিমোগ্লোবিন ভেঙে গিয়ে পেটের দু'পাশে কালচে লাল বা লালচে সবুজ রঙ দেখা দিতে পারে (Turner's sign)।

অগ্ন্যাশয় প্রদাহের কারণে অগ্ন্যাশয় সহ শরীরের অন্যান্য নানা অংশেও ক্ষতিকর প্রভাব পড়তে পারে যেমন—

(ক) স্থানীয় অঞ্চলে—

অগ্ন্যাশয়ে পুঁজ জমা ও সে কারণে তীব্র প্রদাহ (pancreatic abscess ও phlegmon)

অগ্ন্যাশয়ে সিস্টের মত জিনিস সৃষ্টি হতে পারে (pseudocyst)—এর ফলেও ব্যথা হতে পারে, এটি ফেটে যেতে পারে, এর ভেতরে রক্ত পাত হতে পারে, এর জীবাণু সংক্রমণ ঘটতে পারে

পেটে জল জমা (pancreatic ascites)—অগ্ন্যাশয়ের নালিকা বা সিউডোসিস্ট ফেটে গিয়ে

পেটে রক্ত জমতে পারে, স্থানীয় রক্ত বহানালীর থ্রম্বোসিস হতে পারে, এবং এর ফলে অন্ত্রের নানা অংশের মৃত্যু ঘটতে পারে

এবং জণ্ডিস।

(খ) পুরো শরীরে—

শ্বাসতন্ত্র—বুকে জল জমা ও ফুসফুসের কোন অংশ নিরেট বা শক্ত

৫

হয়ে যাওয়া, দুই ফুসফুসের মধ্যবর্তী স্থানে পুঁজ জমা, নিউমোনিয়া, শ্বাসকষ্ট

হৃদপিণ্ড ও রক্ত সংবহন তন্ত্র—রক্ত চাপের হ্রাস, হঠাৎ মৃত্যু, হৃদপিণ্ডের চারপাশে জল জমা ; শরীরের নানা অংশের রক্তবহা নালিকার মধ্যে রক্ত জমাট বেঁধে যাওয়া ও ই. সি. জি.-তে হার্ট অ্যাটাকের মত লক্ষণ

পরিপাকতন্ত্রের নানা অংশে রক্তপাত, পাকস্থলীর প্রদাহ, পেপটিক আলসার)

রেচনতন্ত্র—প্রস্রাব কমে যাওয়া, রক্তে অ্যামোনিয়া বেড়ে যাওয়া ও বৃক্কের শিরা বা ধমনীতে থ্রম্বোসিস এবং এসব কারণে অন্যান্য জটিলতা

বিপাকীয়—হঠাৎ অন্ধত্ব (Purtscher's retinopathy), রক্তে সুগার ও কলেস্টেরল ইত্যাদি বেড়ে যাওয়া ; রক্তে ক্যালসিয়াম কমে যায়, মস্তিষ্কের রোগ

কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্র—মনোবৈকল্য, মস্তিষ্কের রক্তবহা নালীতে চর্বির টুকরো আটকে গিয়ে তার গতিপথ রুদ্ধ হয়ে যাওয়া ও স্ট্রোক।

এ ছাড়া শরীরের নানা অংশে চর্বি জাতীয় উপাদানের ক্ষয় হয়ে গিয়ে বিভিন্ন ধরনের জটিলতা।

হাসপাতালে জরুরীভিত্তিতে অগ্ন্যাশয় প্রদাহের চিকিৎসা করা প্রয়োজন। মুখে কোন ধরনের খাবার না দিয়ে শিরার মাধ্যমে জলীয় দ্রবণ ও ক্যালরির জোগান ঠিক রাখা দরকার। ব্যথা কমানোর জন্য প্রয়োজনীয় ওষুধ এবং প্রয়োজনে অ্যান্টিবায়োটিক ও নাক দিয়ে টিউব ঢুকিয়ে পাকস্থলীর চাপ কমানোর ব্যবস্থা করা—এগুলি চিকিৎসার অঙ্গ।

মদ্যপানের কারণে অগ্ন্যাশয় প্রদাহের এক বিশেষ ধরন দেখা দিতে পারে যেটিতে কিছুদিন অন্তর অন্তরই এ ধরনের প্রদাহ ঘটতে থাকে। এ ছাড়া অগ্ন্যাশয়ের নানা অংশে হাড়ের মত জিনিসও সৃষ্টি হতে পারে (diffuse calcification of pancreas)।

কিডনী ও সেক্স হরমোন—অ্যালকোহলের ফলে প্রস্রাবের পরিমাণ বাড়ে (diuretic)। তবে এটি ঘটে মদ্যপানের প্রথমের দিকে, ক্রমাগত মদ খেয়ে গেলে এ প্রভাব আর থাকে না। ফলে পরের দিকে শরীরে জলের অভাব (dehydration) ঘটার সম্ভাবনা নেই, কিন্তু শরীরে জলের পরিমাণ বেড়ে (overhydration) অসুবিধার সৃষ্টি হতে পারে। আমাদের মস্তিষ্কে

পিটুইটারি গ্ল্যান্ড নামে একটি অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি থাকে। এর পেছনের অংশ থেকে বেরোয় অ্যান্টি ডাইয়ুরেটিক হরমোন—যা প্রস্রাবের পরিমাণকে কমিয়ে তার নিয়ন্ত্রণ করে। অল্প পরিমাণ অ্যালকোহল এই হরমোনের নিঃসরণ কমিয়ে প্রস্রাবের পরিমাণ বাড়ায়, কিন্তু এতে শুধু জলই বেরোয়, লবণ নয়। তাই হার্ট ফেল-এর ক্ষেত্রে মূত্রবর্ধক (diuretic) হিসেবে অ্যালকোহলের কোন উপকারী ভূমিকা নেই। তবে মদের প্রভাবে প্রস্রাবের সাথে ফসফেট ও ম্যাগনেশিয়াম বেশি পরিমাণে বেরিয়ে যায়, ফলে রক্তে এদের পরিমাণ কমে; অ্যামোনিয়াম-ও বেরোয় বেশি।

দেখা গেছে কোন যুবককে ৪ সপ্তাহ ধরে মদ খাইয়ে গেলে তার শরীরে পুং হরমোন টেস্টোস্টেরনের পরিমাণ কমতে থাকে—এই প্রভাব, মদের কারণে যকৃতের কাজ কমে যাওয়ার বা অ্যালকোহলজনিত ভিটামিন ইত্যাদির অভাবের জন্য হরমোনের পরিবর্তন ঘটার ব্যাপারটি থেকে আলাদা। এ কারণেও মদ্যপায়ীদের যৌনক্ষমতা কমে, আংশিক বা সম্পূর্ণ ধ্বজভঙ্গ অবস্থা হয়, যৌনচুল পড়ে যায় বা কমে যায় ইত্যাদি। এর সঙ্গে যকৃত-কোষের অক্ষমতার কারণে স্ত্রী হরমোন, ইস্ট্রোজেনের পরিমাণ শরীরে বাড়ার ফলে ব্যাপারগুলি তীব্রতর হয়।

মদ ও গেঁটে বাত—মদের প্রভাবে পাইরুভেটের ল্যাকটেটে রূপান্তর সহজতর হয়। অল্প পরিমাণ মদ খেলেও এটি বেশ ভালভাবে ঘটতে পারে —আর যারা উপোসী থাকে বা যাদের আগে থেকেই যকৃত কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে আছে তাদের ক্ষেত্রে এটি ঘটে অনেক তীব্রভাবে। এর জন্য ল্যাকটিক অ্যাসিডোসিস নামে এক অবস্থার সৃষ্টি হয়। এটি শরীর থেকে ক্ষতিকর ইউরিক অ্যাসিডের প্রস্রাবের মাধ্যমে বেরিয়ে যাওয়াকে কমিয়ে দেয়। কিভাবে এটি ঘটে তা এখনো পরিষ্কার নয়। তবে এটি পরিষ্কার যে এর ফলে রক্তে ইউরিক অ্যাসিডের পরিমাণ বেড়ে যায় এবং যাদের আগে থেকেই গেঁটে বাত (gout)-এর কিছু প্রবণতা ছিল তাদের মধ্যে তীব্র আকারে গেঁটে বাতের কষ্টকর আক্রমণ ঘটে। এমনকি যাদের গেঁটে বাত ছিল না তাদের মধ্যেও রোগটি দেখা দিতে পারে।

ফুসফুস ও শ্বাসতন্ত্র—এর ওপর নিয়ন্ত্রিত মদ্যপানের প্রভাব বিরাট কিছু ক্ষতিকর নয়। অল্প পরিমাণে মদ খেলে শ্বাসনালিকার প্রসারণ ঘটে (bronchodilator effect) ও তীব্র শ্বাসকষ্টের রোগীদের কিছু উপকার

ঘটতে পারে। এত কম পরিমাণে এটি শ্বাসপ্রশ্বাসকে স্তিমিতও করে না। তবু শ্বাসকষ্টের চিকিৎসায় মদের ব্যবহার যুক্তিযুক্ত নয়, কারণ বিকল্প কার্যকরী ওষুধ জানা রয়েছে এবং এভাবে মদের ব্যবহার থেকেই একজন সুরাসক্ত হয়ে উঠতে পারে। (যেমন অস্ত্রোপচারের পরে তীব্র যন্ত্রণা দূর করতে এলোপাথাড়ি পেথিডিন ইনজেকশান দিলে রোগী পরবর্তীকালে পেথিডিনে নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়তে পারে।)

অ্যালকোহলের মাত্রা বাড়লে সেটি মস্তিষ্কের শ্বাস নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রকে প্রভাবিত করে, এর ফলে দ্রুত শ্বাসপ্রশ্বাস বইতে পারে এবং এর থেকে রক্তের অম্লত্ব কমে গিয়ে (respiratory alkalosis) ভিন্নতর উপসর্গ দেখা দেয়—যেমন হাত পায়ে অসাড় ভাব বা অস্বাভাবিক অনুভূতি, মাথায় ভাবহীন অনুভূতি, এবং অবশেষে খিঁচুনি। কমে যাওয়া অম্লত্বের কারণে স্নায়ুতন্তু ও মাংসপেশীর সংযোগস্থলের উত্তেজনা প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়ে (neuromuscular excitability) এটি ঘটে—একই সঙ্গে রক্তে কমে যাওয়া ক্যালসিয়ামের ভূমিকাও সামান্য থাকে। তীব্রতম অবস্থায় মস্তিষ্কের রক্তবহানালীর সংকোচন ঘটে এবং রোগীর মনোবৈকল্য দেখা দেয়, এমনকি রোগী অজ্ঞানও হয়ে যেতে পারে।

ব্লাডসুগার—অ্যালকোহলের প্রভাবে রক্তে গ্লুকোজ বা শর্করার পরিমাণ অর্থাৎ ব্লাডসুগার বেড়ে যায়। এটি ঘটে শরীরের নানা কলা (tissue)-তে শর্করা গ্রহণের হার কমে যাওয়ার কারণে। এছাড়া স্বয়ংক্রিয় নার্ভতন্ত্রের সিমপ্যাথেটিক অংশের প্রভাবেও রক্তে সুগারের পরিমাণ কিছুটা বাড়ে।

অন্যদিকে মদ শরীরে গ্লুকোজ তৈরি হওয়ার প্রক্রিয়াকে স্তিমিত করে। গরীব মানুষেরা, যারা প্রায়ই আধপেটা খেয়ে থাকে, এমনকি হয়তো ২-৩ দিন বিশেষ কিছু খায়নি—শুধু মদ (যেমন তাড়ি, হাঁড়িয়া, মহুয়া, 'দিশি', 'বাংলা' ইত্যাদি) খেয়েই রয়েছে এবং যারা মদ থেকেই মূলত তাদের শরীরের প্রয়োজনীয় শক্তি (ক্যালরি) সংগ্রহ করে—তাদের যকৃতে গ্লাইকোজেন (এক ধরনের শর্করা জাতীয় পদার্থ) যথেষ্ট কম থাকে। এঅবস্থায় মদ খেলে হঠাৎ শরীরে তথা রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ অত্যন্ত কমে যায় এবং এর কারণে অপরিবর্তনীয়ভাবে মস্তিষ্কের ক্ষতি ঘটে। এর থেকে স্থায়ীভাবে বুদ্ধিবৃত্তি কমে যাওয়া, মনোবৈকল্য বা পাগলামি, এমনকি নানা অঙ্গহানি হওয়াও অসম্ভব নয়। মদ খাওয়ার ৬-১৮ ঘণ্টা পরে রক্তে

গ্লুকোজের কমে যাওয়ার ব্যাপারটা ঘটতে থাকে। মদ খাওয়ার পরে শারীরিক পরিশ্রম করলে (যাও গরীব মানুষদের মধ্যেই বেশি ঘটে) এটি দ্রুততর হয়। এর ফলে রোগনির্ণয় তথা ব্লাডসুগার কম হওয়া ও মস্তিষ্কের ক্ষতির আসল কারণ নির্ণয় করা কষ্টকর হয়ে যায় ; তার সুষ্ঠু চিকিৎসার ব্যাপারটিও হয়ে পড়ে আরো জটিল। এটি অতিরিক্ত বিপদের সৃষ্টি করে। (অবশ্য গরীবরা মদ্যদূষণের তথা মদের কারণে অন্যান্য ক্ষতির জন্য প্রায় সব ধরনের চিকিৎসা সুযোগেরই বাইরে থাকে।)

এছাড়া সম্প্রতি নানা সমীক্ষা ও গবেষণায় দেখা যাচ্ছে মুখ, ফ্যারিংক্স, ল্যারিংক্স ও খাদ্যনালীর **ক্যান্সার** সৃষ্টির ক্ষেত্রেও অ্যালকোহলের যথেষ্ট ভূমিকা সুনিশ্চিতভাবে রয়েছে।

সব মিলিয়ে বিশেষ একজন ব্যক্তির উপর অ্যালকোহলের শারীরিক-প্রভাব অত্যন্ত ক্ষতিকর। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে যারা মদ খায় না তাদের চেয়ে যারা নিয়মিত মদ খায় তারা গড়ে ১৭ বছর কম বাঁচে। তবু বিরল দু'একজনের ক্ষেত্রে ছাড়া, অল্প পরিমাণ মদ এক আধবার খেলে বিরাট কোন ক্ষতি হয়তো হয় না। কিন্তু নিয়মিতভাবে প্রতিদিন বা নিয়মিতভাবে দু'একদিন অন্তর অন্তর মদ খেলেও শরীরের উপর তার স্থায়ী ক্ষতিকর প্রভাব পড়তে থাকে। মদের কারণে মস্তিষ্ক ও মনের উপর যে প্রভাব পড়ে, আপাত ভাল লাগা, অসুস্থভাবে ক্লান্তি কম মনে হওয়া ইত্যাদি যেসব অনুভূতি হয় সেসবের ফলে বিশেষ ব্যক্তি ধীরে ধীরে সুরায় আসক্ত হয়ে পড়ে।

এবং এই আসক্তি ধূমপানের মত নিছক মানসিক নির্ভরতা (psychic dependence) নয়, শারীরিক নির্ভরতারও (physical dependence) সৃষ্টি করে, যে কারণে মদ খেতে খেতে মদ খাওয়া বন্ধ করলে শারীরিক কষ্ট দেখা দেয়, এমনকি মৃত্যুও ঘটতে পারে। এভাবে একসময় সুরাসক্ত ব্যক্তি মদ্যপান বন্ধ করায় বেশ অসুবিধার সম্মুখীন হয় (withdrawal syndrome)। অনেকের ক্ষেত্রে মদের ক্রমবর্ধমান পরিমাণকে শারীরিকভাবে সহ্য করার ক্ষমতা সৃষ্টি (acquired tolerance) আরো জটিলতার সৃষ্টি করে। এটি দেখা গেছে যে, যারা মদ খেতে অভ্যস্ত নয় তারা যে পরিমাণে মদ খেয়ে মাতাল হয়ে যায় অর্থাৎ তার মধ্যে মানসিক ও শারীরিক নানা লক্ষণ দেখা দিতে শুরু করে, মদ্যপানে অভ্যস্ত ব্যক্তিদের মধ্যে ঐ একই লক্ষণ দেখা দিতে

পারে আড়াইগুণ বেশি পরিমাণ মদ খাওয়ার পর। ব্যাপারটি ঘটে, মস্তিষ্ক বেশি পরিমাণ অ্যালকোহল সহ্য করার ক্ষমতা অর্জন করে বলে ; সঙ্গে উৎসেচকের নিঃসরণ বা সক্রিয়তা বৃদ্ধিও ভূমিকা পালন করে। তবে যেভাবেই ঘটুক না কেন এই বর্দ্ধিত পরিমাণ মদ যকৃৎ ও অন্যান্য অঙ্গের ক্ষতি করে অনেক বেশি। পৃথিবীর কোন কোন অঞ্চলের মানুষ জন্মগত-ভাবেও এ ধরনের ক্ষমতা (natural tolerance) অর্জন করতে পারে বলে দেখা গেছে। মঙ্গোলিয়ানদের তুলনায় ককেসিয়ানদের মধ্যে অধিক পরিমাণ মদ খেয়েও মাতাল না হওয়ার ক্ষমতা বেশি।

দুর্বল ব্যক্তিদের চাঙ্গা করতে অনেক সময় অল্প পরিমাণ মদ (যেমন Doctor's Brandy ইত্যাদি) খাওয়ার সুপারিশ করা হয়। এটি কাজও দেয় এবং দীর্ঘদিন কোন রোগে ভোগার পর রোগীকে চাঙ্গা করে তুলতে পারে। কারণ মদ কোন হজম ছাড়াই সরাসরি পাকস্থলী ও ক্ষুদ্রান্ত্র থেকে রক্তে মেশে এবং প্রতি গ্রাম থেকে ৭ ক্যালরি শক্তি পাওয়া যায়। একই সঙ্গে মস্তিষ্কে তার প্রভাবের কারণে ভাল লাগার অনুভূতিও ঘটে। তবে এটি দুর্বলতার চিকিৎসার আদর্শ পদ্ধতি কিনা সে ব্যাপারে বিতর্কের যথেষ্ট অবকাশ আছে। দু'চারবার এভাবে চাঙ্গা হওয়ার পর প্রথমে মানসিকভাবে ও পরে মানসিক-শারীরিক উভয়ভাবে নির্ভরতার সৃষ্টি হয়ে এক সময় আসক্তির সৃষ্টি করতে পারে। তাছাড়া এভাবে চটজলদি শক্তি বা ক্যালরির যোগান পাওয়ার জন্য চিনি বা বড়জোর গ্লুকোজই খাওয়া যেতে পারে। কিন্তু অল্প পরিমাণ মদ খেয়েও যে আপাত ভাল লাগার অনুভূতি ঘটে তা শারীরিকভাবে দুর্বল একজন মানুষকে সাধ্যাতিরিক্ত পরিশ্রম করতেও উৎসাহিত করে। এইভাবে বেশি পরিশ্রম করে ফেললে তা শারীরিক ক্ষতি-সাধনই করে। শারীরিক দুর্বলতার অজস্র কারণ রয়েছে। মদের কারণে কৃত্রিমভাবে সে সব কারণ চাপা পড়ে গিয়ে রোগ নির্ণয়েও অসুবিধার সৃষ্টি করে এবং চিকিৎসা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। আর অল্প পরিমাণ মদও যে বিশেষ বিশেষ কারোর ক্ষেত্রে নানা শারীরিক বিপদ হঠাৎই ডেকে আনতে পারে তা আগে নানা প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে। পাকস্থলীর প্রদাহ, ডায়াবিটিস, চাপা থাকা গেঁটে বাত, পেপটিক আলসার বা যকৃতের অসুস্থতা তীব্রভাবে দেখা দেওয়ার মত অবস্থা সৃষ্টি হওয়া—এভাবে কারো কারোর উল্টে বিপদ ডেকে আনে। বিশেষ কোন দুর্বল রোগীর ক্ষেত্রে যথেষ্ট

সতর্কতা অবলম্বন করে, নিছকই সাময়িকভাবে সীমিত পরিমাণে মদ বা ব্র্যান্ডির ব্যবহার হয়তো করা যায়, তবু সবচেয়ে ভাল পদ্ধতি হল, প্রয়োজনীয় বিশ্রাম নিয়ে এবং উপযুক্ত সাধারণ খাবার-দাবার-পুষ্টির জোগান দিয়ে শরীরকে ধীরে ধীরে সুস্থ করে তোলা।

অ্যালকোহল থেকে যথেষ্ট পরিমাণে শক্তি পাওয়া গেলেও, অ্যালকোহলের পুষ্টিদায়ী কোন ক্ষমতা নেই। প্রোটিন-ফ্যাট-কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্য শক্তি দেওয়া ছাড়াও শরীর গঠনে, শরীরের নানা কোষ-কলার সৃষ্টি-বৃদ্ধিতে সাহায্য করে, কিন্তু অ্যালকোহলের এ ধরনের কোন ক্ষমতা নেই। বরং অ্যালকোহলের দেওয়া এ শক্তি ক্ষতিই করে বেশি। স্বচ্ছল যে সব ব্যক্তি যথেষ্ট খাবারদাবারের বাড়তি হিসাবে সঙ্গে অ্যালকোহল খান তাঁরা শরীরের প্রয়োজনের অতিরিক্ত শক্তি বা ক্যালরি পান। এটি ঐ ব্যক্তিকে শক্তিশালী মোটেই করে না, শরীরের নিজস্ব ক্ষমতায় ফ্যাট বা চর্বি হিসেবে সেটি শরীরে জমা হতে থাকে। এভাবে এঁরা খুব তাড়াতাড়ি মুটিয়ে যান—ভুঁড়ি হয়, হাত-পা গোলগাল হয়ে যায়, মুখ-চোখ ফোলে, চোখের নীচে চর্বির কম্বল দেখা দেয়। অন্য দিকে গরীব মানুষেরা অপুষ্টি ও খাদ্যাভাবের সঙ্গে অ্যালকোহল (তাড়ি, পচুই, মহুয়া, দিশী কিংবা বিলিতি) খেলে কাজের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তির যোগান অনেকটা তা থেকেই পেয়ে যান। অথচ খাবার-দাবারের যে পুষ্টি তা আর পাওয়া যায় না, ফলে অপুষ্টি, যকৃতের স্থায়ী ক্ষতি, ভিটামিনের অভাবজনিত মস্তিষ্কের রোগ ইত্যাদি দ্রুততর হয়। সাধারণভাবে স্বাভাবিক ক্ষুধার সময় পেট পুরে খাবার খেলেই শরীরের প্রয়োজনীয় শক্তির সঠিক যোগান ঘটে এবং পেট ভরে গেলে আর খাওয়া হয় না—ফলে অতিরিক্ত খাদ্যের সরবরাহ নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু অ্যালকোহল খেয়ে পেট ভরে না—তা খেয়ে পেট ভরার তুলনায় শক্তি পাওয়া যায় অনেক বেশি। আর কতটা শক্তি অ্যালকোহল থেকে আসছে, কতটাই বা খাবারদাবার থেকে আসছে—এতসব হিসেব করে মদ খাওরা খুবই দুরূহ ব্যাপার। ফলে শক্তি ও পুষ্টি সরবরাহের মধ্যে সামঞ্জস্য নষ্ট হয়। স্বচ্ছল সুরাসক্তরা অন্যান্য খাবার থেকে ভিটামিন ও পুষ্টির যোগান পেলেও এভাবে অতিরিক্ত শক্তি তথা চর্বি জমার কারণে উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবিটিস, হার্টঅ্যাটাক, স্ট্রোক, ইত্যাদিতে ভোগেন বেশি। এর ফলে হঠাৎ মৃত্যুও ঘটতে পারে। মধ্যবিত্ত বা গরীবদের মধ্যে এগুলির চেয়ে মদের কারণে যকৃৎ ও মস্তিষ্কের রোগের প্রবণতা হয় বেশি।

অবশ্যই এ ব্যাপারে নিখুঁত তুলনামূলক বিচার করা দুরূহ। সিরোসিস ছাড়াও যকৃৎ কোষের বিপত্তির কারণে ও শরীরের সামগ্রিক প্রতিরোধ ক্ষমতা ধীরে ধীরে কমে যাওয়ার জন্য (এক্ষেত্রে অপুষ্টি ও অ্যালকোহল হাত ধরাধরি করেও চলে) যকৃতের পুঁজ হওয়ার ঘটনাও ঘটতে পারে। সাঁওতালদের মত অনেক আদিবাসী গোষ্ঠীর মধ্যে হাঁড়িয়া ইত্যাদি খাওয়া তদের দৈনন্দিন জীবন বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের অঙ্গ। হাঁড়িয়াতে অ্যালকোহলের মাত্রা বীয়ারের মতই কম; অন্তত হুইস্কি, রাম, জিন ইত্যাদির মত সেটি অত কড়া নয়। বহুশত বছরের অভ্যাসের ফলে কিছু সহনশীলতারও সৃষ্টি হয় এবং সবচেয়ে বড়কথা বহু দিনের অভিজ্ঞতায় তাঁরা হাঁড়িয়ার সঙ্গে কিছু প্রোটিন খান (তা সে ভুট্টা, ইঁদুর, সাপ, মাছ, শামুক যা-ই হোক না কেন)। এছাড়া চোলাই না করে বানানোর জন্যে হাঁড়িয়াতে অল্প পরিমাণ ভিটামিন ও প্রোটিনও থাকে। আদিবাসী গোষ্ঠীর মধ্যে হাঁড়িয়া তথা অ্যালকোহলের ব্যবহার ব্যাপক হলেও, সে কারণে স্থায়ী শারীরিক ক্ষতি তুলনামূলকভাবে তত ব্যাপক নয়। একই ভাবে পাশ্চাত্যের নানা দেশে সীমিত পরিমাণে মদ্যপান অতি ব্যাপক হলেও তুলনায় রোগসৃষ্টির হার কম। কিন্তু সবার ক্ষেত্রেই সুরা পান যখন সুরাসক্তির পর্যায়ে চলে যায় তখন তা রোগই, এবং তার থেকে সৃষ্টি হয় অন্যান্য রোগ। এবং এই ভাবে অসুস্থ মানুষের সংখ্যা ঐ সব দেশেও অনেক বেশি।

আমেরিকায় জনস্বাস্থ্য সমস্যার তালিকায় প্রথম দুটি স্থানে রয়েছে হৃদপিণ্ড-রক্তবহন তন্ত্রের রোগ ও ক্যান্সার। তৃতীয়টি হল সুরাসক্তি (alcoholism)। রাশিয়ায় লেনিনের সময় জারি করা মদ্যপানের উপর নিষেধাজ্ঞা, তাঁর মৃত্যুর পর ১৯২৪ সালে তুলে নেওয়া হয়। তার পর গত কয়েক দশকে এত অস্বাভাবিক ভাবে ও দেশে মদ্যপান বেড়েছে যে, সে দেশের সমাজবিজ্ঞানীরা চিন্তিত হয়ে উঠেছেন। শুধু সাইবেরিয়ার গ্রামগুলির উদাহরণ থেকে তার কিছু আঁচ পাওয়া যাবে। ওখানে পেনসানভোগী কোন ব্যক্তি নেই, মূলত সুরাসক্তির কারণেই তাঁরা এ বয়সের আগেই মারা যান। চীনে মদ্য-উৎপাদন ক্রমবর্ধমান, তবু সুরাসক্তি এখনো ওখানে বিশেষ জন-স্বাস্থ্যসমস্যা হয়েছে বলে জানা নেই, যদিও চীনাদের মধ্যে মদ্যপান সম্পর্কে কোন সংস্কার নেই। আমাদের দেশেও সুরার উৎপাদন, ব্যবহার ও সুরাসক্ত

ব্যক্তির সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। বিশেষ করে উঠতি বয়সের তরুণদের (এবং তরুণীদেরও) মধ্যে মদ্যপান বাড়ছে। সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাড়ছে সুরাসক্তির (তথা ড্রাগ ও অন্যান্য নেশার) ব্যাপকতা। অনেক ভারতীয় মহিলারাও মদ্যপান করছেন, কয়েক দশক আগে যা ছিল নিতান্তই সীমিত। শহর বা বস্তি অঞ্চলের গরীব শ্রমিকদের মধ্যেও সুরাসক্তি ক্রমবর্ধমান।

সামগ্রিক বিচারে সাধারণভাবে কোন ধরনের শারীরিক অবস্থাতেই মদের উপকারী কোন ভূমিকা বা চিকিৎসা বিজ্ঞানসম্মতভাবে উপযুক্ত ব্যবহারের কোন সঠিক উদাহরণ নেই। কৃত্রিমভাবে ক্ষণিক আনন্দ পাওয়ার জন্য, সাময়িকভাবে দুঃখকষ্ট ভুলে থাকার আশায়, কিংবা বাইরের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজের একা ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা উপভোগ করার উদ্দেশ্যে, মদ্যপান প্রকৃত পক্ষে কোন না কোনভাবে ব্যক্তির শরীরের শুধু নয়, তার সমাজেরও ক্ষতিসাধন করে। চিকিৎসার ক্ষেত্রে এর কোন ভূমিকা প্রায় না থাকলেও, শরীর ও সমাজে ব্যাপক প্রভাবের কারণে অ্যালকোহল-চর্চা চিকিৎসাবিজ্ঞানে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে।

* * *

মদ তথা ইথাইল অ্যালকোহলের কারণে শারীরিক এই সব ক্ষতির পাশাপাশি মদের ভেজালের জন্যও নানা রোগ, এমনকি মৃত্যু ঘটতে পারে। সাধারণ এ ধরনের ভেজালের অন্যতম হচ্ছে বিষাক্ত মিথাইল অ্যালকোহল। বেআইনীভাবে তৈরি ও বিক্রি হওয়া নানা ধরনের বাংলা বা দেশী, চোলাই মদে এ ধরনের বিষক্রিয়া প্রায়ই ঘটে। সস্তা ও সহজলভ্য হওয়ার কারণে মূলত গরীব মানুষেরাই এর শিকার হন। বিহার সরকার একবার মদের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করার পর ধানবাদের কয়লাখনি অঞ্চলে এ ধরনের বেআইনী মদ খেয়ে বহুজনের মৃত্যু হয়। তারপর 'বাধ্য হয়ে' এই নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়। (অবশ্য নিষেধাজ্ঞা না তুলে ব্যাপক প্রচার ও অন্যান্য ব্যবস্থা অবলম্বন করাটাই সুস্থতর হত।) ১৯৮১তে ব্যাঙ্গালোরে ৩০০ জনের মৃত্যু হয় এভাবেই। ১৯৮২-তে কেরালার ভাপইনে ৭২জন মারা যায়, ১৯৮৫-তে পশ্চিমবঙ্গেই মারা যায় ৩২জন মানুষ চোলাই খেয়ে। প্রতি বছর ভারতে গড়ে কমপক্ষে ২০০জন এ ধরনের বেআইনী বিষাক্ত মদ খেয়ে মারা যায়।

প্রকৃতপক্ষে এদেশে যত আইনী মদ বিক্রি হয় তার অন্তত তিনগুণ বেশি বিক্রি হয় বেআইনী দিশী মদ ও চোলাই। এ মদ প্রায়শঃই থাকে অশুদ্ধ ও বিষাক্ত। এ ধরনের মদ শুধু গ্রাম বা বস্তীর গরীব লোকেরা কিংবা আদিবাসীরা তৈরি করে তা নয়, প্রকৃতপক্ষে এ ব্যবসার বড় পাণ্ডা ক্ষমতাশালী নানা ঠিকাদার ও রাজনৈতিক নেতাও। আইনী মদের ধনী ব্যবসায়ীদের মত এরাও রাজনৈতিকভাবে প্রচণ্ড প্রভাবশালী। আইনী ব্যবসায়ীদের মত এরাও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলকে প্রচুর উৎকোচ দিয়ে নিজেদের সর্বনাশা ব্যবসাকে সংরক্ষিত রাখে। দু'একটা উদাহরণ দেওয়া যায়। ১৯৮১ সালে ব্যাঙ্গালোরের ঐ ঘটনার হোতা সুলতানকে রক্ষা করার জন্য কিছু রাজনৈতিক নেতা উঠে পড়ে লাগে। কেরালার ভাইপীনের ঘটনার পর এমন একজন গ্রেপ্তার হয় যে তখনকার কেরালা কংগ্রেসের কার্য-নির্বাহী সমিতির সদস্য ছিল।

যাই হোক, মিথাইল অ্যালকোহল ইথাইল অ্যালকোহলের চেয়ে অনেক বেশি বিষাক্ত। এটি অ্যালকোহল ডিহাইড্রোজিনেজ উৎসেচকের সাহায্যে প্রথমে ফর্ম্যালডিহাইড ও তারপর ফরমিক অ্যাসিডে জারিত হয়। মূলত এদের কারণেই বিষক্রিয়া ঘটে, অ্যাসিট্যালডিহাইডের চেয়ে এরা অনেক বেশি ক্ষতিকর। এমনিতে, মিথাইল অ্যালকোহলের বিপাকহার ইথাইল অ্যালকোহলের মাত্র শতকরা ১৫ ভাগ অর্থাৎ অনেক মন্থর। তার ওপর সংশ্লিষ্ট উৎসেচকটির ইথাইল অ্যালকোহলের প্রতি ঝোঁক বেশি থাকায়, ভেজাল মদে মিথাইল অ্যালকোহলের বিপাকীয় কাজ শেষ হতে আরো দেরি হয়।

ফর্ম্যালডিহাইড ও ফরমিক অ্যাসিড প্রথমেই চূড়ান্ত ক্ষতি করে চোখের নার্ভ ও রেটিনার। ফলে স্থায়ী অন্ধত্বও হতে পারে। এছাড়া রক্তের অম্লত্ব বেড়ে যায়। সব মিলিয়ে মিথাইল অ্যালকোহল যুক্ত চোলাই বা বেআইনী দেশী মদ খেয়ে মাত্রা ভেদে, মাথার যন্ত্রণা, মাথা ঘোরা, বমি ও বমিভাব, ঝিমুনি ও মস্তিষ্কের ক্ষমতা কমে যাওয়া থেকে শুরু করে শ্বাসবন্ধ হয়ে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটে। সাধারণতঃ খাওয়ার ১২-১৪ ঘন্টার পর কষ্টগুলি দেখা দেয়। চোখের ক্ষেত্রে ঝাপসা দেখা, সাময়িক অন্ধত্ব থেকে সুস্থ হওয়ার পর স্থায়ী অন্ধত্ব এসে যেতে পারে।

মিথাইল অ্যালকোহল দূষণের চিকিৎসায়, ২ ঘণ্টার মধ্যে বমি করিয়ে

পাকস্থলীর জিনিসপত্র বের করে দিতে পারলে সব চেয়ে ভাল। তবে প্রায়শঃই এত তাড়াতাড়ি এসব সম্ভব হয় না। আর যে গরীব মানুষেরা এ ধরনের ভেজাল মদ খায় তারা তো চিকিৎসার প্রায় সুযোগই পায় না। হাসপাতালে আসে তাদের মৃতদেহগুলি বা বড়জোর মুমূর্ষু শরীরটা শেষ অবস্থায়। শিরা দিয়ে প্রচুর পরিমাণে সোডিয়াম বাইকার্বনেটের দ্রবণও দেওয়া দরকার। রক্তে মিথাইল অ্যালকোহলের পরিমাণ ২০-৫০ মিগ্রা. প্রতি ১০০ মি.লি-এ হলে শিরা দিয়ে ইথাইল অ্যালকোহলও দেওয়া উচিত (৫% ডেক্সট্রোজে মিশিয়ে রোগির এক কিলোগ্রাম ওজন প্রতি এক গ্রাম ইথাইল অ্যালকোহল আধঘণ্টার মধ্যে—তারপর ৭-১০ গ্রাম ইথাইল অ্যালকোহল প্রতি ঘণ্টায়)। রক্তে মিথাইল অ্যালকোহলের পরিমাণ এর বেশি হলে একই সঙ্গে রক্ত পাল্টে দেওয়ার (dialysis) ব্যবস্থা করার প্রয়োজন হয়।

সুরা ও সমাজ

মহাভারতের মুষল পর্বে আছে, যদুবংশ ধ্বংস হওয়ার পেছনে ছিল সার্বিক সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও উচ্ছৃঙ্খলতা ; এর সঙ্গে অবশ্যম্ভাবীরূপে সম্পৃক্ত-ভাবে মিশেছিল ব্যাপক সুরাসক্তি। (মদ্যং মাংসমনেকশঃ...ইত্যাদি।) ব্যাপারটি কতটা ইতিহাসসম্মত তা নিয়ে অনেকে বিতর্ক করতেপারেন ; তবে পৃথিবীর নানা সভ্যতার অবলুপ্তির বা জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা অবরুদ্ধ হওয়ার পেছনে প্রায় একই ধরনের ব্যাপার ঘটেছে। সামগ্রিক অবক্ষয়ের পেছনে সামাজিক-অর্থনৈতিক নানা ঘটনার সঙ্গে গভীরভাবে জড়িয়ে থাকে উচ্ছৃঙ্খলতা, ব্যাপক বিলাস-ব্যসন —যার অন্যতম অঙ্গ সুরাসক্তি এবং যেগুলি সৃজনশীলতা, সমাজের বিকাশের জন্য সক্রিয়তা ও সচেতনতাকে ধ্বংস করে। গ্রেকো-রোমান বিজ্ঞানের অধোগতির কারণসমূহ বর্ণনা করতে গিয়ে শ্রীসমরেন্দ্রনাথ সেন মন্তব্য করেছেন, "বিজ্ঞান শুধু বিলাস ও প্রাচুর্যের মধ্যে প্রতিফলিত অবসর-ভোগী মুষ্টিমেয় একদল বিত্তশালী সম্প্রদায়ের শোভা বা পরগাছা রূপে বাঁচিতে পারে না। জ্ঞানের এক স্বাভাবিক সামাজিক প্রয়োজনও উপলব্ধ হওয়া চাই। সেই প্রয়োজন জীবনযুদ্ধে মনুষ্য সমাজকে সাহায্য করিবার প্রয়োজন ; সমগ্রভাবে সমাজের প্রত্যেক নরনারীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানকল্পে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের প্রয়োগের প্রয়োজন। এই জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রয়োগের প্রশ্ন প্রকৃতপক্ষে তখনই উঠে যখন সর্বসাধারণের সহজ জীবনযাত্রা, শ্রীবৃদ্ধি ও কল্যাণ সমাজের লক্ষ্য।" (বিজ্ঞানের ইতিহাস ; ১ম খণ্ড) সামগ্রিক সামাজিক অগ্রগতির জন্য এ ধরনের পরিমণ্ডল থাকা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থাই প্রধান নিয়ামক। তবু এই ব্যবস্থারই অন্যতম অঙ্গ হিসেবে মিশে থাকে সুরাসক্তির মত ব্যাপারগুলি।

মস্তিষ্কের উপর তার প্রভাবের কারণে মদ বিশেষ ব্যক্তিকে করে তোলে নিছক আত্মকেন্দ্রিক এক প্রাণীতে। নিজের ব্যক্তিগত দুঃখ বা হতাশা থেকে মুক্ত হওয়ার আশায় মদ খেয়ে এই মুক্তি হয়তো ঘটে, কিন্তু তা নিতান্তই সাময়িক এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এর ফলে ব্যক্তি তার দুঃখ-দুর্দশা,

দুরবস্থা বা হতাশাবোধের সামাজিক উৎস সম্পর্কে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। সামাজিক-অর্থনৈতিক কারণে সৃষ্টি হওয়া নানা সমস্যার প্রতিফলন ঘটে সমাজেরই অবিচ্ছিন্ন অংশ বিশেষ ব্যক্তির জীবনেও। এভাবে বিশেষ ব্যক্তির মদ্য-নির্ভরতার কারণে সৃষ্টি হওয়া সমাজ-বিচ্ছিন্নতা, দুর্দশার উৎসমূলে আঘাত করে যৌথভাবে সমস্যার সমাধান করা থেকে তাকে বিরত করে এবং এইভাবে সামাজিক সমস্যার স্থায়িত্ব ও জটিলতা বাড়িয়ে তোলে। সব মিলিয়ে বাড়তে থাকে সামাজিক সমস্যা ও মানুষের হতাশা, বাড়তে থাকে মদের মত নানা কিছুতে নিজেকে ডুবিয়ে রেখে মুক্তি পাওয়ার ব্যর্থ ও অসুস্থ প্রবণতা। অ্যালকোহল মানুষের সুস্থ বিচারবুদ্ধি, মূল্যবোধ, নৈতিক বিধিনিষেধ সম্পর্কে সচেতনতা ইত্যাদিকেও ধীরে ধীরে নষ্ট করে। এর ফলে উচ্ছৃংখলতা ও অপরাধপ্রবণতা বাড়ে—সৃষ্টি হয় অসামাজিক কিছু অমানুষের। জীবন সম্পর্কে সুস্থ দৃষ্টিভঙ্গী নষ্ট হতে হতে সুরাসক্ত বা মদ্যপায়ী ব্যক্তি হারিয়ে ফেলে যৌথ উদ্যোগ, যৌথ উদ্যমের মানসিকতা। সব মিলিয়ে যে জীবন সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন কিছু নয়, সেই জীবন সম্পর্কে সুস্থ চেতনাকে বিকৃত ও হত্যা করে মদ বা এ ধরনের নেশার জিনিসগুলি। অনেক কবি সাহিত্যিক তাঁদের তথাকথিত নানা সাহিত্য-কর্মে এবং তাদের বিকৃত আত্মকেন্দ্রিক সমাজবিচ্ছিন্ন (প্রকৃত অর্থে সমাজ-বিরোধী) জীবনযাত্রার মাধ্যমেই, মদ্যপানকে নানা কৌশলে মহীয়ান করে দেখান। ব্যক্তিস্বাধীনতা অর্জন করা, নিজের চেতনায় ডুবে নিজেকে খুঁজে পাওয়া, মুক্ত হওয়া ইত্যাদি নানা আপাত মধুর উদ্দেশ্যে মদ্যপানের প্রয়োজনীয়তাকেই তুলে ধরেন। সমাজ বাস্তবতার নামে, ব্যক্তিগত জীবনে সফল স্বচ্ছল নায়ক সুরাসক্ত হয়েও তার ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষার সিঁড়ি বেড়ে কিভাবে সাফল্যের সঙ্গে উঠে যায়—তার বর্ণনা থাকে। অন্যদিকে ব্যক্তিগত সমস্যায়, দুঃখদুর্দশায় জর্জর, হতাশ নায়ক বা নায়িকার প্রতি পাঠকের সহানুভূতি ও একাত্মতা অর্জন করিয়ে এবং তাকে দিয়ে মদ খাইয়ে, ঐ ফাঁকে তার মুখ দিয়ে নানা বড় বড় কথা বলিয়ে, মদ্যপানের প্রতি তথা আত্মকেন্দ্রিকতার প্রতি পরোক্ষ সমর্থনের ও অবচেতন ভাললাগার মানসিকতা সৃষ্টি করা হয়।

সমাজে যারা পরগাছা তারা ব্যাপক মানুষের মধ্যে এ ধরনের মানসিকতা সৃষ্টিকেই পছন্দ করে। যে গাছকে আশ্রয় করে তাদের বেড়ে ওঠা সেই

মেহনতী, গরীব মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত মানুষদের মধ্যে এ ধরনের নেশা টিকিয়ে রাখার জন্য তারা সচেষ্ট। নিজেদের অনায়াস অর্জিত অর্থকে ফুর্তি ও উচ্ছৃঙ্খলতার মাধ্যমে খরচ করার অন্যতম উপায় তাদের কাছে এই মদ্যপান। অন্যদিকে মেহনতী মানুষদের শোষণ করার, বিপদগামী করার ও সচেতনতা অর্জন করতে না দেওয়ায় অন্যতম উপায় হিসাবে তারা টিকিয়ে রাখে মদ ও এই ধরনের নেশার ব্যবহার। নানা কারখানার আশেপাশে, শ্রমিকদের ঝুপড়িতে দেশী-বিদেশী মদের দোকান ভাল ভাবে চালু থাকে। শ্রমিকদের সামান্য আয়ের বড় অংশটাই চলে যায় মদের পেছনে। চক্রবৃদ্ধিহারে বাড়তে থাকে আর্থিক অনটন, অসামাজিক কার্যকলাপ, পারিবারিক অশান্তি, হতাশা ও মদ্যপান। শ্রমিকরা খায় বা খেতে চায় বলেই মদের দোকানগুলি হয়তো চালু থাকে, কিন্তু আইন করে বা আইনের সাহায্যে মদের দোকান বা মদ বন্ধ করার কোন ব্যবস্থা নেই, নেই মদ্যপানের পেছনের সামাজিক কারণ-গুলিকে দূর করার প্রচেষ্টা। অথচ ক্ষমতাশালীদের অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে সামান্য কোন ষড়যন্ত্রের আভাস পেলেই তাকে নিপুণহাতে অবদমন করার ব্যবস্থা অবলম্বন করার ক্ষমতা রয়েছে। আইন করে বড়জোর যা বন্ধ করা হয় তা হল লাইসেন্সবিহীন দিশী মদের দোকান বা ভাটিখানা-গুলি। কিন্তু মদ খাওয়ার পরিবেশ ও ব্যবস্থা অপরিবর্তিত রেখে তা করার অর্থ ধনী মদ্য ব্যবসায়ীর ব্যবসাকে বাড়িয়ে তোলা ও সুরক্ষিত করা। কোথাও কিছু সচেতন শ্রমিক, বিশেষতঃ বাড়ির গরীব মহিলারা মদ্যপান বিরোধী আন্দোলনে নামলে আইনের সাহায্যে তা দমিয়ে দেওয় হয় এবং লাইসেন্সযুক্ত আইনী মদের দোকানে যাতে আঁচড় না পড়ে তারা জন্য আইনের প্রয়োগ করা হয়। লাইসেন্সওয়ালা মদ্য ব্যবসায়ী তার দোকানের উপর কোন হামলার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে পারে।

সমাজ বিচ্ছিন্ন আত্মকেন্দ্রিকতার পাশাপাশি অভ্যস্ত মদ্যপায়ীদের এবং মত্ত অবস্থায় বিশেষ কোন ব্যক্তির নৈতিক মূল্যবোধ ও সুস্থ সামাজিক বিধি-নিষেধ সম্পর্কে সচেতনতা নষ্ট হয়। এর ফলে যৌন অনাচার, ব্যভিচার, ধর্ষণ, খুন, রাহাজানি, হিংস্র কাজকর্ম ইত্যাদিও বেড়ে চলে। এ ধরনের সামাজিক ব্যাধি বিশেষ ব্যক্তিকে সারাজীবনের জন্য চিহ্নিত করে দেয় এবং পরবর্তীকালে তার সুস্থ কাজকর্মের উপরও এর প্রভাব পড়ে। সদিচ্ছা সত্ত্বেও এভাবে একজনের সুস্থ জীবনে ফেরা প্রায়ই কষ্টকর পড়ে—যদি না

তার পরিবেশ ও সঙ্গীসাথীরা অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি করতে পারে। ঐ বিশেষ ব্যক্তির পরিবারের অন্যান্যরা—বিশেষ করে শিশুরাও এ ধরনের ব্যক্তির অসামাজিক কাজকর্মের দ্বারা প্রভাবিত হয়। শিশু ও তরুণরা বাড়ির বড় কাউকে মত্ত অবস্থায় দেখলে ও মত্ত অবস্থায় অসামাজিক উচ্ছৃঙ্খল কাজ করার কথা জানলে তাদের সুস্থ মানসিক বিকাশও ব্যাহত হয়, অপরাধ-প্রবণতা, হতাশাবোধ ইত্যাদিও বাড়ে। এ ছাড়া অন্যদের কাছে হেয় হওয়া বা অনুকম্পার পাত্র হওয়ার মাধ্যমে হীনমন্যতার সৃষ্টি তো হতেই পারে। পরবর্তীকালে এরাও এ ধরনের নেশায় আসক্ত, ও অপরাধপ্রবণ, বিকৃত মানসিকতার রোগীতে পরিণত হয়।

মদ কত পরিবারে সর্বনাশ ডেকে এনেছে তার বহু উদাহরণ চারপাশে ছড়িয়ে আছে। নেশার কারণে ক্রমবর্ধমান হারে মদের পেছনে যে খরচ হতে থাকে, সেটি বাড়ির সবার খাদ্য ও চিকিৎসার খাতেও টান ধরায়, বাচ্চাদের পড়াশুনাকেও ক্ষতিগ্রস্ত করে।* গরীব থেকে মধ্যবিত্ত সব পরিবারের ক্ষেত্রেই এটি সত্যি। নেশার কারণে উপার্জনকারী ঐ ব্যক্তির শারীরিক ক্ষতি এসব পরিবারেই আবার বেশি হয়। সব মিলিয়ে পরিবার দ্রুত এগিয়ে চলে করুণ আর ভয়াবহ এক পরিণতির দিকে। উচ্চবিত্তরা তবু এ অবস্থার কিছুটা সামাল দিতে পারে।

নিয়মিত মদ্যপানের ফলে ব্যক্তিরও যেমন, সমাজেরও তেমনি সত্যিকারের উপকার কিছু হয় না। উল্টে ঐ ব্যক্তির কাজের দক্ষতা, বিচার বিবেচনার ক্ষমতা, সৃজনশীলতা, বুদ্ধিবৃত্তি ইত্যাদির কমে যাওয়ার ফলে সামগ্রিকভাবে সমগ্র সমাজেরই ক্ষতি হয়। উৎপাদন কমে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিকাশ রুদ্ধ হয়, নৈতিক মানের অবনতি ঘটে। সামাজিক নানা বিষয়ে সুরাসক্ত ব্যক্তির অনীহা, কখনো বা স্পষ্ট বিরুদ্ধ মনোভাবের সৃষ্টি হয় (sociopathy)। সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ লুপ্ত হয়। এইভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় সমগ্র সমাজই। দেশের সুরাসক্ত ও নিয়মিত সুরাপানে অভ্যস্ত ব্যক্তিরা সুরাপানে ও তার পরবর্তী অবস্থায় যত সময় ব্যয় করে, ঐ বিপুল সময়ের কিছু অংশ সমগ্র সমাজের হিতার্থে ব্যয় করলেও সমাজ অনেক উপকৃত হত। এর অর্থ এই নয় যে তারা সব সময়েই পরিশ্রম করবে। ঐ সময়ে সুস্থ সাংস্কৃতিক

* এ সংক্রান্ত একটি পরিসংখ্যানের জন্য ৮৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

চর্চা ও বিকাশের জন্য কাজ করলেও তা একদিকে যেমন আনন্দের খোরাক যোগাবে, তেমনি সামগ্রিক সাংস্কৃতিক মানও উন্নত হতে পারবে।

আমেরিকা বা অন্যান্য পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দেশে সুরাসক্তিকে নিছক একটি স্বাস্থ্য সমস্যা হিসেবেই মূলত দেখা হয়। আমেরিকার সংবিধানের অষ্টাদশতম সংশোধনীতে মদ্যপানকে বেআইনী ঘোষণা করা হলেও ১৯৩৩ সালে ২১তম সংশোধনীতে এই ঘোষণা বাতিল করে দেওয়া হয়। এখন শতকরা ৯০ জন আমেরিকানই জীবনের কোন না কোন সময়ে মদ খায়। শতকরা ৩০-৪০ জন আমেরিকান যুবকদের মধ্যে সুরাপানের কারণে নানাবিধ সমস্যার সৃষ্টি হয়। শতকরা ৫-১০ জন আমেরিকান পুরুষ ও ৩-৫ জন আমেরিকান মহিলা সুরাসক্তির কারণে তাদের আয়ুষ্কালকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। আমেরিকার হাসপাতালগুলোর মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল বিভাগে যতজন রোগী ভর্তি হয় তাদের শতকরা ১৫ জনই অতি মাত্রায় মদ্যপান করার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কারণে অসুস্থ। ১৯৭১ সালের একটি হিসেব অনুযায়ী আমেরিকার প্রাপ্তবয়স্কদের শতকরা ৭জনের মধ্যে তথা প্রায় ৯০ লক্ষ নারী-পুরুষের মধ্যে মদ্যপানের কারণে শারীরিক লক্ষণ পাওয়া গিয়েছিল। এই সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। ১৯৬৫-এর তুলনায় ১৯৮০-তে প্রতি আমেরিকান গড়ে শতকরা ৩২ ভাগ বেশি মদ খায়। স্পষ্টতঃই এই ব্যাপক নেশা দেশের উৎপাদন, দুর্ঘটনা ও অপরাধ, মানসিক-শারীরিক অস্বাস্থ্য, পারিবারিক সংকট ইত্যাদির পেছনে বিরাট ভূমিকা পালন করে। কিন্তু ব্যাপকতর অর্থে সৃষ্টি করে সমাজ বিচ্ছিন্নতা ও আত্মকেন্দ্রিকতা। কিছু সংখ্যক আমেরিকানের প্রাচুর্য থাকলেও আমেরিকায় বুভুক্ষু, গৃহহীন দরিদ্রের সংখ্যা নেহাত কম নয়। এ প্রসঙ্গে সাম্প্রতিক একটি প্রতিবেদন উল্লেখ করা যেতে পারে। নিউ জার্সী থেকে শমীতা দাশ দাশগুপ্ত জানাচ্ছেন (প্রতিক্ষণ, ১৭ই মে—১লা জুন, ১৯৮৭), "১৯৮০-এর পর থেকে শুধুমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই গৃহহীনের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে দশগুণ, কানাডার অবস্থাও এর থেকে বিশেষ ভাল নয়। ...মার্কিন দেশে গৃহহীনের সংখ্যা ৩৫,০০০০ ছাড়িয়েছে। এঁদের পূর্বসূরীদের মত এঁরা আর মদ্যপ, অসামাজিক গোষ্ঠীর সদস্য নন। এঁদের বেশির ভাগই একদিন গ্রহণযোগ্য সমাজের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আজকের গৃহহীনের দলে যোগ দিয়েছে চাল্লিশ অনূর্ধ্ব বহু পুরুষ। এছাড়া, মার্কিন গৃহহারাদের

সংখ্যা দিনে দিনে পুষ্ট করে চলেছে নারী এবং শিশু। ...সুস্থ পরিবার প্রথার ভাঙন থেকে দেশের মানসিক রোগের চিকিৎসার অসাফল্য, সব কিছুই এর জন্য কিছু পরিমাণে দায়ী। এর সঙ্গে কম বেশি দায়িত্ব দিতে হয় দেশে বাড়িঘরের আক্রা এবং গরীবদের মধ্যে সাহায্য বণ্টন ব্যবস্থার গাফিলতিকে।...কোন বাড়ির বারান্দার আনাচে কানাচে বা কারখানার গরম হাওয়া বওয়ার লোহার নালি বা শিকের উপর এঁরা অনেক রাত কাটিয়ে দেন। বাসি খবরের কাগজ হয় এঁদের বিছানা এবং গায়ে দেবার চাদর। শীত কাটাতে এবং বেঁচে থাকার পরিশ্রম ভুলতে অনেকেই মদ ধরেন। ফলে ভিক্ষার সামান্য উপার্জনও নষ্ট হয় এতে।"

একদিকে প্রাচুর্য, যান্ত্রিক বস্তুবাদী সভ্যতার একঘেয়েমি, সুস্থ সামাজিক-পারিবারিক মূল্যবোধের অভাব এবং সবচেয়ে বড় কথা আত্মকেন্দ্রিকতা—এসবের ফলে আমেরিকার মত দেশগুলিতে হতাশগ্রস্ত মানুষের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। এরা মদ, গাঁজা, চরস, ড্রাগ ইত্যাদির নেশায় নিজেদের ডুবিয়ে রেখে বৈচিত্র্য ও বিচ্ছিন্নতা সন্ধান করে। এর পরিবর্ত হিসেবে কেউ কেউ আধ্যাত্মিকতার আশ্রয়ও নেয়, কেউ নেড়া হয়ে খোল-কর্তাল বাজিয়ে নেচেনেচে বেড়ায়। অন্যদিকে দরিদ্র আমেরিকানরাও বৈষম্য, দুঃখ ও হতাশা থেকে মুক্তির উপায় হিসেবে সুরার আশ্রয় নেয়। সব মিলিয়ে পুঁজিবাদী দেশের মুমূর্ষু, অসুস্থ সমাজব্যবস্থার প্রতিচ্ছবি এই ব্যাপক ও ক্রমবর্ধমান সুরাসক্তি।

কিন্তু আরো দুঃখের হল পৃথিবীর আরেক বৃহৎশক্তি ও ভিন্ন সমাজ ব্যবস্থার রাশিয়াতেও এই একই ধরনের প্রতিচ্ছবি দেখা যাচ্ছে—যার ফলে ও দেশের সমাজবিজ্ঞানীরাও চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। ১৯১০ সালে একজন রাশিয়ান বছরে গড়ে ৩·৬ লিকার ভোদকা খেত (হুইস্কি, জিন ইত্যাদির মত ভোদকা খুবই কড়া—শতকরা ৪০ ভাগ অ্যালকোহল থাকে এতে)। ১৯১৪ সালে খেত ৪·৭ লিটার। ঐ বছরই নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়। ফলে ১৯২৫ সালে মাথাপিছু মদ খাওয়া হয় মাত্র ০·৮ লিটার। কিন্তু লেনিনের মৃত্যুর (১৯২৪ সালের ২১শে জানুয়ারি) পর এই নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়। তবু তার ছ' বছর পরেও কিছু সতর্কতার নিদর্শন পাওয়া যায়, রবীন্দ্রনাথের 'রাশিয়ার চিঠি' থেকে। ১৯৩০-এ রাশিয়া গিয়ে, আবালবৃদ্ধবনিতার ব্যবহার্য মস্কোর একটি প্রমোদ উদ্যান দেখে

তিনি জানিয়েছেন এখানে “সাধারণের জন্য আহারের বেশ ভাল কোঅপারেটিভ দোকান আছে, সেখানে মদ বিক্রি বন্ধ।” দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের সময়ও মদ্যপান অনেক কমে যায়। অনেক চোলাই কারখানা বন্ধ করা হয়। কিন্তু ১৯৬০ সালের পর অতি দ্রুত গতিতে মদ্য পান বেড়ে চলে। ১৯৫০-এ একজন রাশিয়ান গড়ে খেতেন ৫ লিটার ভদকা। অথচ ১৯৮০তে একজন রাশিয়ান গড়ে খায় ১০.৮ লিটার এবং ১৯৮৩-তে ৩০ লিটার। শিশু ও সুরাপানে কম অভ্যস্ত বা অনভ্যস্ত ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের ধরে নিয়ে এই পরিসংখ্যান। ফলে প্রকৃত সুরাপায়ীদের ভয়াবহ সুরাপানের বহরটা এ থেকে বোঝা যাবে। ১৯১৩ সালে শতকরা ৯৫ জন রাশিয়ান মহিলা মদ খেতেন না। ১৯৭৯ সালে মদ খান না এমন রাশিয়ান মহিলা শতকরা পাঁচ ভাগেরও কম। ওখানেও সমাজ বিজ্ঞানীরা দেখছেন খুন, বলাৎকার, ছিনতাই, ডাকাতি ইত্যাদি বড় বড় অপরাধের কমপক্ষে শতকরা ২৫ ভাগের পেছনে রয়েছে সুরাসক্তি। উগ্‌লভ, মায়রোভিচ প্রমুখ রাশিয়ান গবেষকরা দেখেছেন জড়বুদ্ধি শিশুর সংখ্যাও ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে। ১৯৮২তে সোভিয়েত শিশুদের মধ্যে শতকরা ১৬.৬ জন ছিল মানসিক-শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী। সোভিয়েত একাডেমি অব্ সায়েন্সেস্-এর রিপোর্ট অনুযায়ী সেদেশের প্রতি সাতজনের একজন তথা প্রায় ৪ কোটি সোভিয়েত নাগরিক সুরাসক্ত। ভদকা খাওয়ার ফলে প্রতি বছর ১০ লক্ষ রাশিয়ানের মৃত্যু ঘটে এবং ১ কোটি ৭০ লক্ষ জন গুরুতরভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। এই একাডেমি মন্তব্য করেছেন, “আমাদের প্রবল মাদকাসক্তির দরুণ রুশ জাতির দ্রুত অধঃপতন ঘটছে……আমাদের জাতীয় ইতিহাসে এটি হল সবচেয়ে করুণ ঘটনা”। এমনকি তাঁরা এও বলেছেন, এই নেশার ভয়ংকরতার পাশাপাশি বিচার করলে “দুনিয়া ধ্বংস, হবার কিংবা আন্তর্জাতিক উত্তেজনা বৃদ্ধির যাবতীয় কথা হাস্যকর বলে মনে হয়।” (এমনকি সোভিয়েত প্রভাবিত হাঙ্গেরিতেও এ নেশা ও সে কারণে জনস্বাস্থ্য বিপর্যয় ক্রমবর্ধমান। ১৯৬৬-তে সেদেশে মৃত্যুহার ছিল প্রতি হাজারে ১০ জন; ১৯৮৩-তে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৩.৯-এ।) পৃথিবীর চিকিৎসকদের প্রতি চারজনের একজন রাশিয়ান। সামাজিক বৈষম্য আমেরিকার মত দেশের তুলনায় অনেক কম। শিল্পোন্নত সে দেশ, সম্পদেও সে দেশ সমৃদ্ধ। তবু মূলত সুরাসক্তির কারণে রাশিয়ায় প্রতি

হাজারে মৃত্যু হার ১৯৬০ সালে ৭.১ ও ১৯৬৫-৬৬ তে ৬.৭ এর তুলনায় ১৯৮০-তে দাঁড়িয়েছে ১০.৪-এ। কিন্তু এসবের চেয়েও সে দেশের সচেতন ব্যক্তিরা এখন মূলতঃ চিন্তিত বৈপ্লবিক চিন্তা-চেতনা, সামাজিক মূল্যবোধ, দেশের ও বিশ্বের জনগণের প্রতি দায়িত্ব পালন, জাতীয় অধঃপতন—এসবের ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান সুরাসক্তির ও সুরাপানের নেতিবাচক প্রভাবের কারণে।

১৯৩০ সালে রাশিয়ায় গিয়ে রবীন্দ্রনাথ সেখানকার বৈপ্লবিক সামাজিক পরিবর্তনে অভিভূত হয়েছিলেন। তাঁর 'রাশিয়ার চিঠি'-র প্রথম চিঠির প্রথমেই ছিল পুরো দেশের জনমানসের রূপান্তর দেখে বিস্ময়। এখনো পৃথিবীর কোটি কোটি মুক্তিকামী মানুষ এ দেশের কাছে অনেক প্রত্যাশা করে। কিন্তু সম্প্রতিকালে তার মাদকাসক্তির মত সামাজিক অবক্ষয়গুলির কারণ খুঁজে বের করে সংস্কারমুক্ত খোলামনে তা দূর করার মত পরিবেশ সৃষ্টি না করতে পারলে এ প্রত্যাশা হতাশাতেই রূপান্তরিত হবে। আমেরিকার মত নাগরিকদের একাংশের চরম দুরবস্থা এখানে নেই। কিন্তু অবাঞ্ছিত সামাজিক দিকগুলিকে মোহমুক্তভাবে অবশ্যই মাথায় রাখা দরকার।

দুটি দেশে পৃথক সমাজ ব্যবস্থা চালু থাকলেও পৃথিবীর এই দুটি উন্নত দেশ, আমেরিকা ও রাশিয়ায় মদের এ ধরনের প্রভাব সারা পৃথিবীর মানব জাতির সামনেই সতর্ক বার্তা উচ্চারণ করছে। চিকিৎসাবিজ্ঞান সম্মত তথ্যই হচ্ছে, **"আধুনিক জীবনযাত্রার প্রভাবে ক্রমবর্ধমান মনোরোগ জনস্বাস্থ্য সমস্যায় আরো বেশি করে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করছে। সুরাসক্তি ও মাদক ওষুধে নেশা এই দিকটিরই প্রতিফলন।"** * রাশিয়াতে এখনো মাদক ওষুধের নেশা আমেরিকার মত এত প্রবল হয়ে ওঠেনি। তবুও সুরাসক্তির ব্যাপারটি মাথায় রেখেই, চিন্তাটি এখানে যে, যে আধুনিকতা অবশ্যই কাম্য সেই আধুনিকতার প্রভাবে সামাজিক ও সমগ্র মানব সমাজের এ ধরনের অসুস্থতার সমাধান কি ধরনের সামাজিক পরিমণ্ডলে করা সম্ভব। রাশিয়ায় উন্নততর প্রগতিশীল সমাজতান্ত্রিক সমাজের কথা বলা হয়। চিন্তাটা এ কারণেই বেশি। এই ১৯৮৭ সালেরই প্রথম সাত মাসে শুধুমাত্র মস্কোর প্রকাশ্য রাস্তা থেকে ১ লক্ষ ৮৫ হাজার

* Text Book of Preventive & Social Medicine ; Park & Park ; 1983.

মাতালকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সরকার থেকে সুরাসক্তির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া সত্ত্বেও প্রকাশ্যে এভাবে মাতালদের উপস্থিতিতে সোভিয়েত নেতা মিখাইল গোর্বাচভ উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন (The Statesman, ২.৮.৮৭)। সম্প্রতি ও দেশেও কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। যেমন রেস্তোরাঁতে একজনকে ২০০ মি. লি- এর বেশি ভোদকা বিক্রি ও ২১ বছর বয়সের নীচে মদ্যপান নিষিদ্ধ করা হয়েছে, বহু মদের দোকান বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ইত্যাদি। কিন্তু এগুলি বাহ্যিক কিছু ব্যবস্থা। প্রয়োজন সামাজিক মূল কারণকে খুঁজে বের করে দূর করা। এটি ঠিকই যে, আত্মকেন্দ্রিক, বৈষম্যমূলক, ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষাভিত্তিক ও শোষণজীবী সমাজ ব্যবস্থায় এ সমস্যা সমাধান করা সম্ভব নয়। আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের সুফলকে পৃথিবীর সব মানুষের কল্যাণে সমভাবে প্রয়োগ করার আন্তরিক ইচ্ছার ও তার বাস্তবায়নের সঙ্গে পারিবারিক বন্ধন, মানবিক সম্পর্ক ও মূল্যবোধের উন্নয়ন, কুসংস্কারমুক্ত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রসার, এবং সর্বোপরি বৈষম্যহীন সমাজ ইত্যাদি এ ধরনের সমস্যা সমাধানের কিছু দিক। সমাজবিজ্ঞানী ও সাধারণ মানুষকে এ নিয়ে আরো ভাবতে হবে ও সমাধানের উপায় খুঁজে বের করতে হবে। সুরাসক্তি এই সামগ্রিক সমস্যারই একটি দিক ও অবিচ্ছেদ্য অংশ। সুরা প্রকৃত সমস্যা নয়, আমাদের সংস্কারাচ্ছন্ন মধ্যবিত্ত-সুলভ মানসিকতা অনুযায়ী এক আধবার সুরাপান করলেও তা নিন্দার্হ—এ ধরনের ধারণাও ঠিক না। আসল সমস্যা হচ্ছে সুরাসক্তি এবং সুরার উপর শারীরিক-মানসিকভাবে নির্ভরতার প্রয়োজনীয়তা কেন মানুষের মধ্যে ক্রমবর্ধমান। সুরাসক্তি সামাজিক হতাশা ও সমস্যাবলী থেকেই সৃষ্টি হয় এবং তাকে বাড়িয়েও তোলে।

আমাদের দেশে গত শতাব্দীর গোড়ার দিকে এক ধরনের বাবুশ্রেণীর উদ্ভব হয়েছিল। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজরা তাদের অনুগত একদল বিত্তশালী তৈরির জন্য চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে কিছু মানুষের সৃষ্টি করেছিল যারা ন্যূনতম শারীরিক-মানসিক শ্রম দিয়েই অঢেল সম্পদের অধিকারী হয়। পচাঘায়ে মাছির মত এদের চারপাশে কিছু সুবিধাভোগী মোসাহেব-গোষ্ঠীরও সৃষ্টি হয়। এদের দু'একজন ব্যতিক্রম বাদ দিলে বাকী সবাই এই সম্পদকে হাল্কা আমোদ-প্রমোদ আর ইংরেজ তোষণের কাজে ব্যয় করেছে। না লাগিয়েছে সে সম্পদকে কলকারখানায় তথা পুঁজিবাদী

বিকাশে না ব্যয় করেছে জনগণের হিতার্থে। এই হাল্কা-আমোদ প্রমোদের একটি বড় অংশ জুড়ে ছিল ব্যাপক সুরাপান। এর ফলে এদের অধিকাংশের দ্বারাই সৃজনশীলভাবে এমন কিছু গড়ে ওঠেনি যা সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করত। এরা তাদের বাড়তি সম্পদ ও সময়কে কাজে লাগিয়ে গঠনমূলক কোন কাজ করার ক্ষমতাই হারিয়ে ফেলেছিল—যার পেছনে মস্তিষ্কে সুরাসক্তির প্রভাবও অন্যতম কারণ। এরা জন্ম দিয়েছিল নিজেদেরই মত বংশধরদের।

ইংরেজরা এদেশে আসার আগে তাড়ি, ধেনো, দিশী ইত্যাদির চলন যে ছিল না তা নয়। কিন্তু দু'একটি ব্যতিক্রম বাদ দিয়ে তা মূলত সীমিত ছিল দরিদ্র ও অশিক্ষিতের মধ্যে। পরবর্তীকালে শিক্ষিত, তথাকথিত বুদ্ধিজীবি ও ধনী-স্বচ্ছলদের মধ্যে সুরাপানের বন্যা আসে ইংরেজদের দেখাদেখি, তাদের অনুকরণ ও তোষণের জন্য এবং তাদের প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ সহযোগিতায়। ঐ সময়কার চিত্র ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এভাবে কথায় এঁকেছেন—

"কটকট কটাকট টক টক টক।
ধুনো ধুনো ধুন ধুন ঢক ঢক ঢক ॥
সেরা চেরী বীর ব্রাণ্ডি ওই দেখ ভরা।
এক বিন্দু পেটে গেলে ধরা দেখি সরা ॥
ধন্যরে বোতলবাসী ধন্য লাল জল।
ধন্য ধন্য বিলাতের সভ্যতার কল ॥"

শীতপ্রধান দেশের ইংরেজদের অনুকরণে বিলাতের সভ্যতার কল এদেশে এভাবে—বিশেষত সমাজের ক্ষমতাশালী ও প্রভাবশালীদের মধ্যে চালু হওয়ায়, ইংরেজদের শাসন-শোষণ-প্রতিপত্তি যে কিছুটা নির্ঝঞ্ঝাট হয়েছে, তা স্পষ্ট।

অন্যদিকে হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিওর (জন্মঃ ১৮.৪.১৮০৯; মৃত্যু ঃ ২৬.১২.১৮৩১) মুক্ত চিন্তার আদর্শে উদ্বুদ্ধ ইয়ং বেঙ্গল সদস্যদের সুরাপানের কথা সুবিদিত। কিন্তু এই সুরাপানের মধ্যে রক্ষণশীল ও সংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দু সনাতনী চিন্তার বিরুদ্ধে সংস্কারমুক্ত বিদ্রোহী মানসিকতাই প্রধান ছিল।* তবু আমরা দেখি সুরাসক্তির কারণে কত প্রতিভার

* তবে 'ইয়ং বেঙ্গল'-দের এধরনের কাজকর্ম সমাজে সাময়িক নাড়া দিলেও তার প্রকৃত কার্যকারিতা ছিল সীমিত। এটি সীমিতও ছিল

অপমৃত্যুর কথা। মাইকেল মধুসূদন দত্ত মাত্রাতিরিক্ত সুরাসক্তির কারণে কিভাবে উত্তরপাড়ার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের ঘরের (বর্তমানে জয়কৃষ্ণ লাইব্রেরী নামে পরিচিত) দোতলায় রক্ত বমি করেছেন তার করুণ বর্ণনা আমরা জানি। জানি কিভাবে মূলত সুরার কারণে চরম দারিদ্র্য ও পারিবারিক সর্বনাশের দিকে এগিয়ে গেছেন তিনি।

তবু এই কিছু বছর আগে পর্যন্তও ভারতের মত এই গরীব, শিল্পে অনুন্নত দেশে সুরাপান এত ব্যাপক ও ভয়াবহ ছিল না। কিন্তু গত দু' তিন দশকের মধ্যেই তা প্রচণ্ডভাবে বেড়ে গেছে। শহরাঞ্চলে তো বটেই, এখন গ্রামের অনেক চায়ের দোকানেও রাত্রে বসে দিশি-বিলিতি মদের আসর। মফঃস্বলে রাস্তার ধারে দেখা যাচ্ছে সুরম্য বিলিতি মদের দোকান।* ১৯৭৬

মূলতঃ উচ্চ বর্ণের মধ্যে (যদিও তার পরোক্ষ কিছু সুফল সাধারণ মানুষ পেয়েছে)। আর হিন্দুদের সনাতনী চিন্তায়,সুরাপানকে নিষিদ্ধ করা ছিল এই শ্রেণীর জন্যই—দ্বিজাতি বা ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যদের জন্য, দাস বা শূদ্রদের জন্য নয়। স্পষ্টতঃ মদ খেয়ে সংস্কার ভাঙ্গার ব্যাপারটিও বিপুল সংখ্যক নিম্ন বর্ণের মানুষদের ক্ষেত্রে আদৌ প্রাসঙ্গিক ছিলনা। এব্যাপারে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (জন্ম ঃ ১৮২০) তবু কিছু প্রগতিশীল ধ্যানধারণায় চালিত হয়েছেন। "সংস্কার প্রচেষ্টাকে তৎকালীন পরিবেশে সফল করতে হলে কোন কোন বিষয়ে সতর্ক ও সাবধান হতে হবে, শাস্ত্রীয় ও সামাজিক নানান কুসংস্কারের প্রতি খোলাখুলি অথবা বেপরোয়া অশ্রদ্ধাপ্রকাশ না করে সেগুলির মূলে কিভাবে কুঠারাঘাত করতে হবে, এ বিষয়ে বাস্তব কর্মপন্থা নির্ধারণেও তিনি (ঈশ্বরচন্দ্র) যথেষ্ট যত্নবান ছিলেন। একদিকে তাঁর পূর্ববর্তী ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীর পরিণতি এবং অন্যদিকে দেশীয় সমাজ ও লোকাচার সম্পর্কে তাঁর সুগভীর জ্ঞান এ দুইই এক্ষেত্রে তাঁর সহায়ক ছিলো।" ('ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও উনিশ শতকের বাঙালী সমাজ' ; বদরুদ্দিন উমর) এই 'পরিণতির' পেছনে সংস্কার ভাঙার জন্য সুরাপানের মত কর্মসূচী এবং শরীর-মনে তার প্রভাবটিকেও এড়িয়ে যাওয়া উচিত নয়।

---

* অথচ হাসপাতাল বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে জীবনদায়ী ওষুধের অভাবে, সঠিক চিকিৎসা না পেয়ে কতজন অকালে মারা যায়। শুধু সাপের বিষের ওষুধ (Antivenom Serum) না পেয়ে বছরে কমপক্ষে ২৫ হাজার ভারতীয় মারা পড়ে। কুষ্ঠের ওষুধ বাজারে কিনতে প্রায় পওয়াই যায় না। পোলিও-র টীকার অভাবে প্রতি বছর প্রায় ১০০০০ ভারতীয় শিশু পঙ্গু হয়ে যায়।

সালে ভারতের সুরা ব্যবসায়ীরা ১৬ কোটি ৯৪ লক্ষ লিটার বিশুদ্ধ অ্যালকোহল ব্যবহার করেছে যার থেকে ৩৫ কোটি বোতল 'রাম' তৈরী করা যায় ('রাম'-এ থাকে ৪০% অ্যালকোহল এবং একবোতলে থাকে প্রায় ৪০০ মি. লি.)। কিন্তু১৯৮৫ সালেই বিশুদ্ধ অ্যালকোহলের ব্যবহার বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৩ কোটি১০ লক্ষ লিটার—যা থেকে ১১৩ কোটি ৪০ লক্ষ বোতল 'রাম' তৈরী করা যায়। মনে রাখতে হবে এই সময় কালে জনতা সরকার চেষ্টা করেছিল 'সুরা নিবারণের' জন্য এবং পরে কংগ্রেস(ই)-ও সিদ্ধান্ত নিয়েছিল বিশুদ্ধ অ্যালকোহলের ব্যবহার অন্ততঃ ১৯৮১ সালের পরিমাণ, ২০ কোটি ৭৯ লক্ষ লিটারে সীমিত রাখার। ভারতের পাঁচটি বৃহৎ সুরা ব্যবসায়ীদের অন্যতম ম্যাকডাওয়েল তার ব্যবসা প্রতি বছর শতকরা ১০ ভাগ বাড়িয়ে চলতে পেরেছে। এখন ভারতে প্রায় ৩০০০ কোটি টাকার মদ বিক্রি হয় (দেশী, চোলাই, ধেনো, হাঁড়িয়া ইত্যাদির বেশ কিছু পরিমাণ বাদ দিয়েই)। এবং মদ্য ব্যবসায়ীরা রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও প্রভাবশালী। তথাকথিত জনপ্রতিনিধি মারফৎ তারা তাদের ব্যবসা সুরক্ষিত ও বর্দ্ধমান রাখে।

মহারাষ্ট্রে বীয়ার-এর বিক্রি ১৯৮০ থেকে ১৯৮৫-তে ১৪০ লক্ষ বোতল থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৪০ লক্ষ বোতলে। ১৯৮৫ তে পশ্চিমবঙ্গেও ১২০ লক্ষ বোতল বীয়ার বিক্রি হয়েছে। কিন্তু এধরনের হিসাব হিমবাহের ভেসে থাকা ক্ষুদ্র অংশই। কারণ এর বাইরে রয়েছে বিপুল পরিমাণ দেশী মদ, হাঁড়িয়া, চোলাই ইত্যাদি।

পাঁচ বছর আগেও ভারতের বড় বড় হাসপাতালের মানসিক রোগীদের মাত্র ০.২% ছিল সুরাসক্ত। বর্তমানে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে শতকরা ২০-৩০ ভাগে। বোম্বাই-এর কে. ই. এম. হাসপাতালের একটি পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, আগে বিশেষতঃ বস্তী অঞ্চল থেকে এ ধরনের রোগী আসত। এখন ব্যাংক অফিসার, ম্যানেজার, সরকারী অফিসার, কারখানার কর্মী, মধ্যবিত্ত—কেউই প্রায় বাদ নেই। অনেক কারখানায় সুরাপানের কারণে শ্রমিক-কর্মচারীদের গরহাজিরার হার ২-৩ গুণ বেড়ে গেছে। ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব্ মেডিক্যাল রিসার্চ ১৯৮৫ সালের একটি সমীক্ষায় দেখেছেন, শিল্পশ্রমিকদের অর্ধেক সংখ্যকই এখন মদ খায়। রাস্তায় যে দুর্ঘটনা ঘটে এখন তার শতকরা ২৫ ভাগের পেছনেই রয়েছে সুরাপান। অল ইণ্ডিয়া

ইনষ্টিটিউট অব্ মেডিক্যাল সায়েন্স দিল্লীতে করা একটি সমীক্ষায় দেখেছেন রাস্তায় দুর্ঘটনায় মাথায় আঘাত পাওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে শতকরা ২০ জনই মদ খেয়েছিল।

অনেকে মৃদু বীয়ারকে কিছু নিরাপদ ভাবেন (এতে শতকরা ৪-৮ ভাগ অ্যালকোহল থাকে)। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটিই একজনকে ধীরে ধীরে সুরাপানে অভ্যস্ত করে তোলে, সুরাসক্ত অবস্থার দিকে ঠেলে দেয়। মৃদু বা কড়া সব মিলিয়ে এখন বছরে একজন ভারতীয় গড়ে খায় ১ লিটার বিশুদ্ধ অ্যালকোহল। অস্ট্রেলিয়ায় তা ১.৫ লিটার, আমেরিকায় ৪.১ লিটার। কিন্তু ও সব দেশে বেশ কিছু সংখ্যক মহিলারাও মদ খান। ভারতে এ ধরনের মহিলার সংখ্যা নগন্য (বড়জোর সুরাপায়ীদের শতকরা ২ ভাগ)। স্পষ্টতই সুরাপায়ী ভারতীয়রা প্রকৃতপক্ষে মদ খায় অনেক বেশী। এবং এভাবে হিসাব করলে তা দাঁড়াবে ৪.১ লিটার বিশুদ্ধ অ্যালকোহল, পাঞ্জাবে তা ৬.৫ লিটার।

ভারতের শ্রমিকদের মধ্যে ক্রমবর্দ্ধমান মদ্যপান কি ভয়াবহ সামাজিক-পারিবারিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে তার আঁচ পাওয়া যাবে মাদ্রাজ পোর্ট ট্রাষ্টের শ্রমিকদের মধ্যে করা সমাজ বিজ্ঞানী সরস্বতী শংকরণের একটি সমীক্ষা থেকে। এদের অর্ধেকের বেশী মদ খায় এবং তিনজন শ্রমিকের একজনই সুরাসক্ত। তিনি দেখেছেন যারা মদ খায়, তাদের তুলনায় যারা মদ খায় না, তারা আর করে প্রায় দেড়গুণ, খাবারের পেছনে শতকরা ৮ ভাগ বেশি খরচ করতে পারে, আর কাপড় চোপড়ের পেছনে শতকরা ৩০ ভাগ বেশি, স্বাস্থ্যের পেছনে শতকরা ১৬৮ ভাগ বেশি এবং ছেলেমেয়েদের পড়াশুনার পেছনে ৩০০ ভাগ বেশি। দেখা গেছে, দারিদ্র্য,অপুষ্টি, যৌন সম্পর্ক ও স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বোঝাপড়ার অবনতি, অবাধ্য-উচ্ছন্নে যাওয়া সন্তান—এ সবের পেছনেই মদের বিরাট ভূমিকা রয়েছে। ভারতে কম পক্ষে ৮ কোটি জন মদ খায়—তবে গ্রামে-বস্তিতে, পাহাড়ে-জঙ্গলে আরো অনেকেই ছড়িয়ে আছে যারা এ হিসাবের বাইরে। ৬০-এর দশকে প্রতি ৩০০ জন মদ্যপায়ী ভারতীয়দের মধ্যে একজন ছিল সুরাসক্ত রোগের রোগী ; কিন্তু ১৯৮০ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসাব অনুযায়ী তা দাঁড়িয়েছে প্রতি ২৫জনে একজন। ১৯৮৫ সালে ব্যাঙ্গালোর, দিল্লী, ডিব্রুগড় ও রাঁচীতে করা একটি সমীক্ষায় ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব্ মেডিক্যাল রিসার্চ দেখেছেন শহরাঞ্চলের শতকরা

২০ জন মদ্যপায়ী মদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে পড়েছেন, গ্রামাঞ্চলে এটি আরো ভয়াবহ—শতকরা ৩০-৪০ জন। বহুজনই এ নিয়ে চিন্তিত। আফিমের মত মদ (ও কিছু ড্রাগ) মস্তিষ্ককে যেভাবে প্রভাবিত করে এবং সুরাসংক্রান্ত শাস্তিগুলিকে যেভাবে শিথিল করা হয়েছে ('সুরা ও আইন' দ্রষ্টব্য) তার থেকে এ সন্দেহ অমূলক নয় যে এ ধরনের ক্রমবর্ধমান সুরাসক্তি হয়তো বা সচেতন ভাবেই সৃষ্টি করা হচ্ছে। মনে পড়িয়ে দেয় গত শতকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা কিভাবে চীনে আফিম ছড়িয়ে দিয়েছিল তাদের শাসন-শোষণকে দীর্ঘস্থায়ী করতে।

সামাজিক দিক থেকে সুরার ক্ষতিকর ছাড়া ইতিবাচক কোন ভূমিকা নেই। তাই পুরো দেশ জুড়েই এধরনের ক্ষতিকর সামগ্রীর বিরুদ্ধে প্রচার গড়ে তোলা ও আইন কানুন করা দরকার। কিছু আদিবাসী গোষ্ঠীর মধ্যে ঐতিহ্যগত ভাবে মদ খাওয়া তাদের সাংস্কৃতিক জীবনের অঙ্গ—একারণে তাদের মধ্যে ব্যাপারটি বাধা পাবে বলে ধারণা হতে পারে। তবে প্রকৃতপক্ষে এঁদের মধ্যেও যাঁরা শিক্ষিত হচ্ছেন তাঁদের মধ্যে যথেচ্ছ হাঁড়িয়া খাওয়া অনেক কম। এঁদের কেউ কেউ হয়তো হাঁড়িয়া না খেয়ে 'বিলিতি' খান কিন্তু সেটি নিজস্ব সংস্কৃতির তাগিদে নয়, বরং তথাকথিত আধুনিক, অবক্ষয়ী সংস্কৃতির অনুকরণেই। তাই আদিবাসী গোষ্ঠীর মধ্যেও শিক্ষা ও সচেতনতার প্রসার ঘটলে মদ্যপানের প্রবণতা কমবে। অর্থাৎ এর জন্য শিক্ষা বিস্তার ও সচেতনতা বৃদ্ধি পূর্বসর্ত, জোর করে আইন চাপিয়ে দেওয়া নয়। এ ছাড়া আদিবাসীদের ব্যাপক অংশই দরিদ্র ও অবহেলিত। পেটপুরে স্বাভাবিক খাবার না পাওয়ার জন্য সহজলভ্য সস্তা হাঁড়িয়া বা দেশি মদ খেয়ে শক্তির যোগান রাখার প্রবণতারও সৃষ্টি হয়। এর জন্য এদের আর্থিক উন্নতিও জরুরী যাও তাদের মধ্যে ব্যাপক মদ্যপানের প্রবণতা কমানোর অন্যতম পূর্বসর্ত। এটি পুরো দেশের সামাজিক পরিকল্পনা ও ব্যবস্থার সাথে যুক্ত। কিছু কিছু আদিবাসী গোষ্ঠীকে (যেমন লোধাদের) অপ-রাধপ্রবণ হিসেবে ছাপ মেরে দেওয়ার প্রবণতা অনেক তথাকথিত সমাজ বিজ্ঞানীর মধ্যে দেখা যায়। এর পেছনে এই সব গোষ্ঠীর সামাজিক অবস্থান, পুরুষাণুক্রমিক দারিদ্র্য ও বঞ্চনা এবং সাথে মস্তিষ্কের উপর মদের প্রভাবের কারণে ন্যায়-অন্যায় বোধ ও নৈতিক মূল্যবোধ কমে যাওয়ার ব্যাপারগুলিকে প্রায় গুরুত্বই দেওয়া হয় না। একইভাবে বস্তি অঞ্চলে ও অতি দরিদ্র

জনগোষ্ঠীর মধ্যে মদ খাওয়া কমানো বা বন্ধ করার জন্যও প্রয়োজন তাদের দারিদ্র্য ও বঞ্চনার সমাধান, সামাজিক হতাশা কাটানো, শিক্ষা ও সচেতনতার প্রসার। শুধু টেলিভিশনে বিজ্ঞাপন দিয়ে বা মদ খাওয়া বন্ধ করার জন্য আইন করে কোন লাভ হবে না।

অনেকে এও বলতে পারেন, দেশে মদের ব্যবহার কমিয়ে দিলে বা বন্ধ করলে লক্ষ লক্ষ লোক বেকার হয়ে যাবে (ভারতে অন্ততঃ ২০ লক্ষ লোকের জীবিকা এর সাথে জড়িত)। শুল্ক বাবদ যে কোটি কোটি টাকা আয় হয় তাও বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই বিপুল জনশক্তির বড় অংশকেই নতুন শিল্প স্থাপন ও উৎপাদনের কাজে সুপরিকল্পনার সাহায্যে নিয়োগ করা যায়। তাতে দেশের সম্পদ ও মুদ্রাগম যেমন অনেক বাড়তে পারে, তেমনি লক্ষ লক্ষ লোক ব্যক্তিগত ও সামাজিক-পারিবারিক অপমৃত্যুর হাত থেকেও বাঁচবে। বিশেষ ক্ষেত্রে অতি নিয়ন্ত্রিত ভাবে সুরার ব্যবহার চালু রেখেও তা করা যায়। সম্প্রতি মেক্সিকো ও কানাডায় ধূমপানের সমস্ত বিজ্ঞাপন বন্ধ করা হয়েছে, সিগারেটের উৎপাদন ব্যাপক ভাবে কমানো হচ্ছে ইত্যাদি। হিসেব করে দেখা গেছে এর ফলে সরকারী আয় কয়েক কোটি টাকা কমলেও, ধূমপানের কারণে জন স্বাস্থ্য খাতে যা ব্যয় হয় তা বেঁচে যাওয়ার ফলে এ ক্ষতি পুশিয়ে যাবে তো বটেই বরং সামগ্রিকভাবে দেশের সম্পদ বৃদ্ধি পাবে।

শুধুমাত্র গাড়ীর ড্রাইভারদের মধ্যে মদ্যপান নিয়ন্ত্রণ করলে কিভাবে দেশের আর্থিক সাশ্রয় হয় তার একটি পরিচয় পাওয়া যাবে নিউ সাউথ ওয়েল্‌-এর একটি উদ্যোগ থেকে। ওখানে প্রতিদিন শুধু এক ঘণ্টা ড্রাইভারদের মধ্যে, তারা মদ খেয়েছে কিনা তার জন্য বিশেষ চেকিং করায় বছরে খরচ হয় ৫০ লক্ষ অস্ট্রেলিয়ান ডলার। কিন্তু এর ফলে যেভাবে দুর্ঘটনা কমেছে, তাতে চিকিৎসা ও সামাজিক নিরাপত্তা খাতে ব্যয় কমেছে ১৩ কোটি অস্ট্রেলিয়ান ডলার। (দি স্টেটসম্যান, ৩১. ৭. ৮৭)

সামগ্রিক সুরানিয়ন্ত্রণের ফলে স্পষ্টতভাবে শুল্ক বাবদ আয়ের চেয়ে বহুগুণ অর্থের সাশ্রয় করা সম্ভব—বিশেষত ভারতের মত উষ্ণ অঞ্চলের গরীব দেশে এটি অত্যন্ত জরুরীও বটে। ধূমপানও ব্যক্তি বিশেষের ক্ষতি করে, পরিবেশ দূষণও ঘটায়। কিন্তু এর ফলে ব্যক্তিত্ব, মূল্যবোধ, সামাজিক দায়িত্ববোধ, সৃজনশীলতা ও মননক্ষমতা ইত্যাদির হানি তথা

মস্তিষ্কে মদ-এর মত তীব্র প্রভাব হয় না বল্লেই চলে। সমাজিক দিক থেকে এ কারণে ধূমপানের চেয়ে মদ (ও অন্যান্য ড্রাগ)-এর নেশা অনেক বেশি ক্ষতিকর ও চিন্তার বিষয়। তাই এর নিয়ন্ত্রণ আরো জরুরী।

তবে এ ধরনের নিয়ন্ত্রণ হঠাৎ করে হওয়ার নয়। সুরাশিল্পের সাথে জড়িত কর্মীদের সুষ্ঠু পুনর্বাসন করা হবে এই নিয়ন্ত্রণের প্রধান পূর্বসর্ত। তবে আরো গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে সুরাসক্তির সামাজিক কারণ দূর করা—যে হতাশা, বিচ্ছিন্নতা, দারিদ্র্য, বঞ্চনা, বৈষম্য, নিরাপত্তাহীনতা, বিলাস বা প্রাচুর্যের কারণে মানুষ মদ খায় তার উৎসমূলে আঘাত করা।

এ সব সর্ত পূরণ না করে নিছক সুরাপান নিবারণী আন্দোলনও নেহাতই সংস্কারমূলক, সাময়িক ও ব্যর্থ প্রচেষ্টা মাত্র।

[এই অধ্যায়ে (ক) আমেরিকার পরিসংখ্যান গুলির অন্যতম সূত্র Harrison's Principles of Internal Medicine, 10th Asian Edition (খ) রাশিয়ার—ভ্লাদিমির ট্রেমল-এর Death from Alcohol Poisoning in USSR, Soviet Studies, 1982 ও স্তেভান ভারি, ইস্তভান কেমেনি, স্টিপান লিন্ডগ্র্যানের বিভিন্ন লিখা ; অনীক, মার্চ, ১৯৮৭ ও বাউলমন প্রকাশিত সতুবাদ্য-র পুস্তিকা 'মদ' (গ) ভারতের পরিসংখ্যান গুলির অন্যতম সূত্র India Today, 30.4. 86.]

সুরাসক্তির চিকিৎসা

বিশ্বস্বাস্থ্যসংস্থার মতে সুরাসক্তি বাড়িয়ে তোলার পেছনে দু'টি ঘটনা দায়ী—সুরার সহজলভ্যতা ও সুরার ক্রমবর্দ্ধমান চাহিদা। সুরাসক্তি রোধ করার জন্য এ দু'টি দিকেই নজর দেওয়া উচিত। প্রথমটি সরকারী আইনের দ্বারা সম্ভব। দ্বিতীয়টির সাথে যুক্ত রয়েছে সামাজিক অর্থনৈতিক দিকগুলি।

স্পষ্টতঃই সুরাসক্তির চিকিৎসারও দু'টি দিক—বিশেষ ব্যক্তিকেন্দ্রিক এবং সামাজিক। তবে উভয়েই পরস্পরের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। বিশেষ ব্যক্তির কথা ভাবতে গেলে অবশ্যই তার পরিবেশ-সঙ্গী-বন্ধুবান্ধবের কথা, সামাজিক অবস্থান তথা দারিদ্র্য বা প্রাচুর্য, হতাশা বা বিলাসব্যসন—এগুলিকেও মাথায় রাখা দরকার। আবার সামাজিক উৎসমূলে আঘাত করার ক্ষেত্রেও বিশেষ ব্যক্তির বা গোষ্ঠীর বিশেষ দিকগুলিকে মাথায় রাখা দরকার। এ সমাজে ব্যবসায়িক তথা শাসক গোষ্ঠীর স্বার্থের কারণে নানা কৌশলে সৃষ্টি করা হয় চাহিদা। তারপর চলে যোগান দেওয়ার কাজ।

এর আগে সুরাসক্তি বা ক্ষতিকর পরিমাণে মদ্যপানের কারণে যে সব রোগ হয় তার চিকিৎসা সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে সুরাসক্তি (alcoholism, alcohol addiction) রোগের চিকিৎসার ব্যাপারটি আলোচনা করা হল।

এই ধরনের সুরাসক্ত ব্যক্তিদের কেউ কেউ (যদিও এদের সংখ্যা খুব কম) নানা শারীরিক কষ্ট ও রোগ তীব্রভাবে দেখা দেওয়ার আগেই মদ্যপান ছাড়ার ইচ্ছা প্রকাশ করতে পারেন—হয়তো অন্যের দ্বারা সচেতন হয়ে। আবার আসন্ন বিপদ এড়ানোর জন্যও কারোর ক্ষেত্রে জোর করে এ নেশা ছাড়ানোর চেষ্টা করতে পারে তার আত্মীয়স্বজন ও শুভানুধ্যায়ী বন্ধু-বান্ধবেরা। অন্যদিকে সুরাসক্ত ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট, কোন কষ্ট নিয়ে (যেমন হয়তো রক্তবমি, অজ্ঞান অবস্থা, খিঁচুনি, তীব্র মনোবৈকল্য, যকৃতের সিরোসিস জনিত নানা অবস্থা ইত্যাদি) হাসপাতালে ভর্তি হতে পারে চিকিৎসার জন্য। বিশেষ এই অবস্থার সামাল দেওয়ার পর প্রয়োজন হয় নেশাটি ছাড়ানোর চেষ্টা করার।

সবার ক্ষেত্রেই সুরাসক্তি ছাড়ানোর প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে চিরতরে ও সম্পূর্ণভাবে মদ্যপান বন্ধ করা। অনেকে এরকম ধারণা করেন যে, মদের নেশা ছাড়ানোর জন্য ঐ বিশেষ ব্যক্তিটি নিজে থেকে ইচ্ছা প্রকাশ না করলে নেশা ছাড়ানো সম্ভব নয়। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিজের থেকেই এ ইচ্ছা জাগা মুস্কিল। প্রকৃতপক্ষে দেখা গেছে, দীর্ঘদিনের সুরাসক্ত ব্যক্তিদের প্রতি তিনজনের একজনই উপযুক্ত চিকিৎসা পেতে আদৌ চায় না, আর একজন উপযুক্ত চিকিৎসায় সুস্হ হয়ে ওঠে এবং বাকীজনের ক্ষেত্রে চিকিৎসা সত্তেবও রোগটি আবার দেখা দেয়। তবু সবার ক্ষেত্রে আসক্তির চিকিৎসার জন্য অবশ্যই উদ্যোগ নেওয়া দরকার। চিকিৎসক, আত্মীয়স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব—সবারই উচিত সুরাপানের কুফল সম্পর্কে রোগীকে বুঝিয়ে বলা এবং তার শরীরে যে সব লক্ষণ দেখা দিয়েছে ও দিতে পারে তার ভয়াবহতা ও ভবিষ্যৎ পরিণতি সম্পর্কে তাকে ওয়াকিবহাল করা। এভাবেই অনেকের মধ্যে নেশা ছাড়ার মনোভাব তৈরী হয়। এক্ষেত্রে শুধু আবেগ নয়, সাথে বিজ্ঞানসম্মত যুক্তি থাকা দরকার। এবং সুরাসক্ত ব্যক্তির সঙ্গীদের, যেখানে চাকরী করে, যাদের সাথে মেলামেশা করে তাদেরও ব্যাপারটি বুঝিয়ে বলে তাদের সহযোগিতাও আদায় করা দরকার।

নিছক আবেগ বা মানবিক মূল্যবোধের বড় বড় কথা বলে কিংবা নীতিবাগিশের মত জ্ঞান দেওয়া জাতীয় আলোচনা করে সুরাসক্ত ব্যক্তির মধ্যে নেশা ছাড়ানোর ইচ্ছা জাগানো মুস্কিল। এবং সবচেয়ে বড় দরকার রোগীর প্রতি সহানুভূতি। কি পরিবেশে সে মদের নেশায় ডুবে গেছে তা বিস্তারিত অনুসন্ধানে জানা দরকার। তার নেশার জন্য শুধু তাকেই দোষারোপ করে গেলে ও তার কানের কাছে হা-হুতাশ করে গেলে তার হতাশা, বিচ্ছিন্নতা, হীনমন্যতা ইত্যাদি বাড়বে বই কমবে না এবং সেটি তাকে আরো নেশার দিকে ঠেলে দেবে। তবু এমন ধারণাও দেওয়া উচিত নয় যে সে ধোওয়া তুলসীপাতা। তাই তার এই নেশার পেছনের কারণগুলি নিয়ে তার সাথে আলোচনা করার পাশাপাশি সুরাপান সম্পর্কে তার নিজের দায়িত্ব সম্পর্কেও তাকে সচেতন করা দরকার। নেশার পেছনের সব কারণের সমাধান করা চিকিৎসক বা অন্য কারোর পক্ষে হয়তো তক্ষুনি সম্ভব নয়, যেমন দারিদ্র্য, বেকারত্ব বা চাকুরি থেকে ছাঁটাই, দাম্পত্য জীবনে অশান্তি, মিথ্যে মামলায় জড়িয়ে

পড়া, সামাজিক অপমান ইত্যাদি। কিন্তু মদের নেশা কিভাবে এগুলিকে বাড়িয়ে তোলে এবং এর ফলে সুরাসক্ত ব্যক্তি কিভাবে সুরার সর্বনাশা অন্তহীন চাকায় বাঁধা পড়ে যায়—সে সম্পর্কে তাকে সুনিশ্চিত করা দরকার। স্পষ্টতঃই একাজ একজন বিশেষ কোন চিকিৎসক বা ব্যক্তির কাজ নয়, বহুজনের যৌথ উদ্যোগ (team work) প্রয়োজন একজনের নেশা ছাড়াতে গেলেও। এই যৌথ উদ্যোগে চিকিৎসকের সাথে আত্মীয়-বন্ধুদেরও থাকা প্রয়োজন। এবং একাজ দু'একদিনেরও নয়, ধৈর্য নিয়েই করা দরকার। সংশ্লিষ্ট চিকিৎসক কিংবা শুভানুধ্যায়ী আত্মীয় বা বন্ধু নিজের উদ্যোগে ঐ বিশেষ সুরাসক্ত ব্যক্তির চারপাশে এধরনের একটি দল গড়ে তুলতে পারেন। পূর্বোক্ত ব্যাপারগুলি মাথায় রেখে এই দল নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে কর্মপদ্ধতি ঠিক করে নিতে পারেন এবং সুরাসক্ত ব্যক্তির দৈনন্দিন জীবনের নানা সময়ে ও নানা পরিস্থিতিতে তাকে সুরাপান থেকে বিরত করার চেষ্টা চালিয়ে যেতে পারেন।

এবং এই বিরতি সম্পূর্ণই হওয়া উচিত। কেউ কেউ সুবিধাজনকভাবে এরকমও ব্যবস্থা নিতে পারেন—ধীরে ধীরে মদ্যপানের পরিমাণ কমিয়ে ; যেমন প্রতিদিন হিসেব করে মদের পরিমাণ শতকরা দশভাগ করে কমিয়ে দশদিনে সম্পূর্ণ বন্ধ করা। তবু নিজের তাগিদ ও বাইরের চাপ না থাকলে এত হিসেব করতে নেশাগ্রস্তরা প্রায়ই রাজী হয় না। কিন্তু মদ্যপানের পরিমাণ বেশ কিছু কমিয়ে নিয়মিতভাবে অল্প বা মাঝারি পরিমাণের সুরাপান করে গেলেও তা শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর। সবচেয়ে বড় কথা এধরনের অভ্যাসই ঐ বিশেষ ব্যক্তিকে কয়েক মাস বা কয়েক বছর পরে—হয়তো বা বিশেষ কোন মানসিক চাপ বা হতাশা দুঃখের সময়ে, তাকে পরিপূর্ণ সুরাসক্ত অবস্থার দিকে ঠেলে দিতে পারে। তাই দীর্ঘদিন ধরে অল্প অল্প করে মদ খাওয়া কমিয়ে কমিয়ে একসময় মদ খাওয়া ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্তটিও প্রায় সবার ক্ষেত্রেই একটি ব্যর্থ সিদ্ধান্তেই পর্যবসিত হয়। বিরল ক্ষেত্রে ছাড়া, এভাবেও সুরাসক্ত ব্যক্তি তার আসক্তিমুক্ত হতে পারে না। অধিকাংশ সুরাসক্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে নানাদিক থেকে (যেমন বাড়ীর লোক বা চাকরির জায়গা) চাপ এলেই তবে তারা নেশা ছাড়ার উদ্যোগ নেয়। এই চাপটা দরকার। এবং যত দ্রুত সম্ভব মদ খাওয়া বন্ধ করা দরকার।

তবে দীর্ঘদিন ধরে ভাল পরিমাণে মদ খেতে অভ্যস্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে মদ বন্ধ করা বা কমানোর পর কিছু অসুবিধে দেখা দিতে পারে (withdrawal syndrome)। এটির জন্য কি কি অসুবিধা ও লক্ষণ দেখা দিতে পারে এবং তাদের চিকিৎসার কথা আগে উল্লেখ করা হয়েছে। ('সুরা ও শরীর' অংশে মস্তিষ্কের উপর প্রভাব দ্রষ্টব্য।) এ ধরনের অসুবিধার জন্য অনেক সময় বাড়ীতে রেখে নেশা ছাড়ানোয় মুস্কিল হয়। সুরাসক্ত ঐ ব্যক্তি যথেষ্ট চাতুর্যের সঙ্গে তার কষ্টগুলিকে এমনভাবে প্রকাশ করে যে তার মা, স্ত্রী বা নিকট আত্মীয় কেউ অস্থির হয়ে ও ঐ কষ্ট না দেখতে পেরে মদের যোগান দিতে বাধ্য হয়। তাই হাসপাতাল বা সুরক্ষিত কোন জায়গাতেই রোগীকে রাখা দরকার। তবু মৃদুভাবে কষ্টগুলি দেখা দিলে ডায়াজিপাম বা ক্লোরডায়াজেপক্সাইড-এর মত ঘুমের ওষুধ দিয়ে বাড়ীতেই তার চিকিৎসা সম্ভব। তীব্রতর অবস্থায় অবশ্যই হাসপাতালে ভর্তি করে জরুরী ভিত্তিতে চিকিৎসা করা দরকার। এবং সব ক্ষেত্রেই রোগীর মধ্যে মদ ছাড়ার ইচ্ছা জাগিয়ে তোলার পাশাপাশি মদ ছাড়লে যে মৃত্যু ঘটে না (বরং মদ খেয়ে গেলেই মৃত্যু ত্বরান্বিত হয়) বা ঐ অসুবিধাগুলি যে সাময়িক ও চিকিৎসার যোগ্য—এসব ব্যাপারে তার মনে আস্থা জাগিয়ে তোলা দরকার।

কোন রোগী এ ধরনের চিকিৎসার পর এবং তার নিজের ইচ্ছার দ্বারাই কয়েকদিনের মধ্যে মদ খাওয়া বন্ধ করে দিতে পারে। এর পর যাতে আবার মদ খাওয়া না শুরু হয় তার জন্য তার সঙ্গীসাথী, বন্ধুবান্ধব ও বাড়ীর লোকেদের ভূমিকা অনেকখানি। তার দরকার সত্যিকারের বন্ধু যে তাকে এই বিপদ থেকে রক্ষা করে রাখবে। প্রয়োজন এমন পারিবারিক পরিবেশ যা তাকে আবার মদের দিকে ঠেলে দেবে না। এবং অবশ্যই প্রয়োজন আত্মকেন্দ্রিকতার গন্ডী কাটিয়ে সামাজিক নানা কাজকর্ম-সংগঠনে যুক্ত থাকা—যা বিচ্ছিন্নতা কাটিয়ে বৃহত্তর স্বার্থে তার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব সম্পর্কে আত্মোপলব্ধি ঘটাবে।

কিন্তু এতসবের পরেও কেউ কেউ থাকে যে কোনভাবেই মদ না খেয়ে থাকতে পারে না। এধরনের সুরাসক্ত ব্যক্তির চিকিৎসা সময় সাপক্ষ, তবে সম্ভব। এর জন্য প্রয়োজন তার সাথে দীর্ঘদিন ধরে, ধৈর্য ধরে আলাপ আলোচনা চালানো—যা মনোচিকিৎসক-এর মাধ্যমে হলেই ভাল। প্রয়োজন বৃহত্তর সামাজিক কাজ ও জীবনের সাথে জড়িয়ে থাকা। এবং প্রয়োজন ওষুধ।

এই ওষুধের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ডাইসালফিরাম। * এটি অ্যালকোহলের বিপাকীয় ক্রিয়াকে প্রভাবিত করে এবং এর ফলে শরীরে অস্বাভাবিক মাত্রায় এ্যাসিট্যালডিহাইড জমা হয়। তাই এ ওষুধ খাওয়া-কালীন মদ খেলে পাঁচ মিনিটের পরই মাথার যন্ত্রণা, ঘাম হওয়া, শ্বাস কষ্ট, বুকে ব্যথা, বমি, বমি ভাব, অস্বস্তি, মাথা ঘুরিয়ে যাওয়া ইত্যাদি ঘটে। খুব বাড়াবাড়ি হলে খিঁচুনিও হতে পারে। বারবার এভাবে ঘটলে রোগীর মধ্যে মদ খাওয়ার প্রতি আগ্রহ ধীরে ধীরে নষ্ট হয়। মদ কয়েকদিন বন্ধ করার পর এটি শুরু করা উচিত—তা না হলে আগে থেকেই রক্তে থাকা অ্যালকোহলের কারণে পূর্বোক্ত শারীরিক কষ্টগুলি শুরু হয়ে যেতে পারে। সাধারণতঃ সকালে ২৫০ মি. গ্রা. পরিমাণ খেতে হয় এবং তা চালিয়ে যেতে হয়। তবে যাদের হৃদপিণ্ড বা যকৃতের রোগ রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে এটির ব্যবহার করা মোটেই নিরাপদ নয়। গর্ভবতী মহিলার ক্ষেত্রেও এর ব্যবহার গর্ভস্থ শিশুর পক্ষে বিপজ্জনক। (Short limb diformity হয়) (এ ধরনের মহিলার ক্ষেত্রে অন্যান্য ব্যবস্থা নেওয়া দরকার।) আর কয়েকমাস বা কয়েক বছর ধরে খেয়ে গেলে ডাইসালফিরাম থেকে নার্ভের রোগও দেখা দিতে পারে (polyneuropathy)। তাই বেশ কিছুদিন ধরে যারা ডাইসালফিরাম খাচ্ছে তাদের মধ্যে হাত পায়ের ঝিনঝিনি, অস্বাভাবিক অনুভূতি (যেমন পিঁপড়ে চলা, সুড় সুড় করা, চামড়ায় অস্বস্তিবোধ ইত্যাদি) এসব দেখা দিলে ওষুধটি বন্ধ করে দেওয়া দরকার। যে সব সুরাসক্ত ব্যক্তি ইচ্ছে সত্ত্বেও নিজের মানসিক তাগিদে মদ বন্ধ করতে পারে না, তাদের ক্ষেত্রে এ ধরনের চিকিৎসা উপযুক্ত ও অবশ্যই ফলদায়ী। তবু ডাইসালফিরামের কারণে খিঁচুনি বা 'শক' (যা বিরল ক্ষেত্রে ঘটে) এড়ানোর জন্য এর মাত্রা ঠিকভাবে বিচার করা দরকার ; ওষুধটি শুরু করার আগে হৃদপিণ্ড ও যকৃতের অবস্থাও বিচার করে নেওয়া প্রয়োজন।

---

* বাণিজ্যিক নাম এন্টাবিউজ। আমাদের দেশে এসপেরাল (Esperal) (Torrent ওষুধ কোম্পানির) নামেও ২৫০ মি. গ্রা. ট্যাবলেট পাওয়া যায়। প্রথম দিন ১ গ্রাম, দ্বিতীয় দিন ০·৭৫ গ্রাম, তৃতীয় দিন ০·৫ গ্রাম ও ৪র্থ দিন ২৫০ মি. গ্রা. খাওয়ার কথা বলা হয়। অন্যভাবে প্রতিদিন একটি ট্যাবলেটও খাওয়া যায়।

ডাঃ জ্যাকবসন ও ডাঃ হ্যাল্ড—এই দুই ড্যানিশ ভেষজ বিজ্ঞানী ঘটনাচক্রে সুরাসক্তির চিকিৎসায় ডাইসালফিরামের উপযোগিতা আবিষ্কার করেন। এ পদার্থটি রবার কারখানার কর্মীদের কাছে অনেকদিন থেকেই পরিচিত, তবে চিকিৎসার জন্য ব্যবহৃত হত না। ঐ দুই বিজ্ঞানী প্রথমে কৃমির চিকিৎসায় পদার্থটির ব্যবহারের কথা ভাবেন কারণ ডাইসালফিরাম তাম্র ঘটিত লবণের বিপাকে বিপত্তি ঘটায়। কৃমির শরীরের কিছু উৎসেচকের কাজের ক্ষেত্রে এজাতীয় লবণের ভূমিকা রয়েছে এবং তাই কৃমির চিকিৎসায় একে হয়তো ব্যবহার করা যাবে—এই ছিল তাঁদের ধারণা। কিন্তু অন্যের উপর ব্যবহারের আগে নিজেদের শরীরে নতুন ওষুধ প্রয়োগ করে দেখে নেওয়াটা তাঁরা নীতিগতভাবে অনুসরণ করতেন। তাই তাঁরা ডাইসালফিরাম খান; সবিস্ময়ে দেখেন তারপর অল্প পরিণাণ মদ খেয়েও পূর্বোক্ত নানা শারীরিক উপসর্গ দেখা দিচ্ছে এবং মদ খাওয়ার ইচ্ছেটাই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আরো গবেষণায় এ ব্যাপারে তাঁরা সুনিশ্চিত হন।

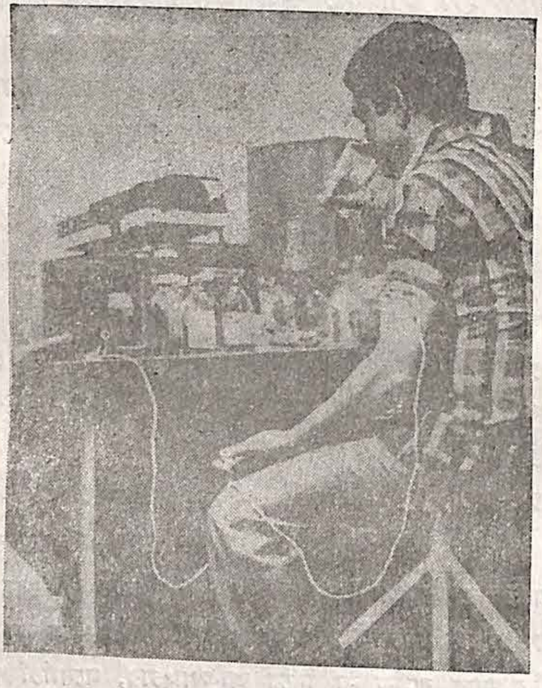
ডাইসালফিরাম ছাড়া ক্যালসিয়াম কার্বাইড নামে আরেকটি ওষুধও একই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যায়—তবে এর কার্যকারিতা কিছু কম। তবু একারণেই যে সব ব্যক্তি আবার মদ খাবেনই বলে আগে থেকে বোঝা যায়, তাঁদের ক্ষেত্রে প্রথমে এটি দিয়ে শুরু করা যায়—তাহলে ডাইসালফিরামের কারণে তীব্রতর কষ্টগুলি এড়ানো যেতে পারে।

সম্প্রতি সুরাসক্তির চিকিৎসায় (ধূমপানের নেশা, নানা ড্রাগের নেশায়ও) আকুপাংচারের ভূমিকা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। এর ফলে নেশা বন্ধ করার কারণে কষ্টগুলি (withdrawal syndrome) যেমন কম হয়, তেমনি এসব নেশার প্রতি আগ্রহও কমে। ডাইসালফিরাম জাতীয় ওষুধের বিরূপ প্রতিক্রিয়ার ঝুঁকি না নিয়ে আকুপাংচার, মনোচিকিৎসা ও যৌথ চিকিৎসা অত্যন্ত কার্যকরী।

একবার মদ ছাড়ার পর সামান্য পরিমাণে মদ খাওয়াও উচিত নয়। কারণ সুরাসক্ত ব্যক্তি সুরাত্যাগ করলেও তার মনের গভীরে মদের প্রতি সুপ্ত ইচ্ছা থেকেই যায়। বিশেষ অনুষ্ঠান বা উপলক্ষের বাহানা করে একবার মদ খাওয়া শুরু করলে, এই ইচ্ছা তীব্রতর হয়ে তাকে আবার নেশার পথে ঠেলে দেয়। হজমের ওষুধ, টনিক ইত্যাদি নামে পরিচিত অনেক জিনিষে অ্যালকোহল থাকে বীয়ার-এর চেয়েও বেশি। একবার মদ ছাড়ার পর

এমনকি এসবও খাওয়া উচিত নয়। খাওয়া উচিত নয় পুরনো জল ঢালা ভাত বা পান্তা ও তার জলও—এতেও কিছু অ্যালকোহল থাকে।

ওষুধ ছাড়া বিশেষ ব্যক্তির জন্য বিমুখী চিকিৎসা (aversion therapy) করাও যায়। এতে চিকিৎসাধীন সুরাসক্ত রোগীকে মদ দেওয়ার সাথে ইলেকট্রিক শক বা এই ধরনের কষ্টদায়ক কোন উত্তেজনা দেওয়া হয়ে থাকে। বারবার এভাবে করে রোগীর মস্তিষ্কে শর্তাধীন প্রতিবর্তী ক্রিয়ার (conditioned reflex-এর) এবং মদের প্রতি অনীহার সৃষ্টি করা হয়। এটি



জনৈক সুরাসক্তের বিমুখী চিকিৎসা চলছে

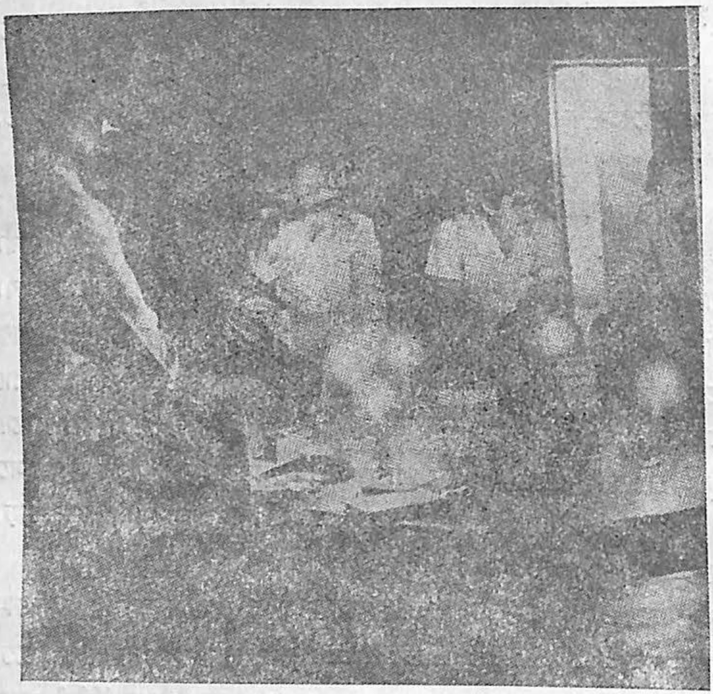
অনেক ক্ষেত্রেই কার্যকরী বিশেষতঃ যাদের ডাইসালফিরাম দেওয়া যায় না (যেমন, যাদের যকৃৎ খুব খারাপ, গর্ভবতী মহিলা, ওষুধটি খেয়ে যার খিঁচুনি ও নার্ভের রোগ হয় বা হয়ে গেছে)—তবে পাশাপাশি মানসিক ও সামাজিক ব্যাপারগুলিকে অবশ্যই সামাল দেওয়া দরকার।

ব্যক্তিগত এ ধরনের চিকিৎসার সাথে গোষ্ঠী চিকিৎসা (group therapy) করাও কাম্য। অভ্যস্ত সুরাপায়ীরা সাধারণতঃ একই ধরনের

বন্ধুবান্ধব-সঙ্গীসাথীদের সাথে মিশতে ভালবাসে। এই সঙ্গ দূর করে, যারা মদ খায় না বা একসময় সুরাসক্ত ছিল এখন ছেড়ে দিয়েছে কিংবা ছাড়ার জন্য সত্যিই আন্তরিকভাবে সচেষ্ট, তাদের নিয়ে একটি দল গড়ে তার সাথে মেশার সুযোগ করে দেওয়া উচিত। একই সাথে এই পুরো দলটির মধ্যেই সুস্থ জীবনের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করা এবং তাদের যৌথ কোন সামাজিক কাজে যুক্ত করা দরকার। নেশাগ্রস্তরা মূলত আত্মকেন্দ্রিক। এই আত্মকেন্দ্রিক সংকীর্ণতা কাটিয়ে উঠতে গোষ্ঠী চিকিৎসা তাকে সাহায্য করে। খুলে যায় অবরুদ্ধ মনের জানালা। গোষ্ঠীর সবাই মিলে নিজেদের সমস্যাবলী নিয়ে আলোচনা করতে পারেন। গোষ্ঠীর যাঁরা মদ ছেড়েছেন তাঁদের সুস্থতর জীবন দেখে যাঁরা ছাড়তে পারছেন না তাঁরাও উৎসাহিত হন এবং মদ ছেড়ে দেওয়া যে সম্ভব সে সম্পর্কে আত্মবিশ্বাস জন্মায়। এই গোষ্ঠীর মধ্যে কোন না কোন সময় নেশাগ্রস্ত ছিল এরকম লোকেরা থাকাই ভাল—তাহলে পারস্পরিক বিশ্বাস জন্মাতে পারে ভালভাবে। যারা কোনদিন মদ ছোঁয়নি তারা সাধারণতঃ নেশাগ্রস্তদের একটু অন্য চোখে দেখে এবং নেশাগ্রস্তরাও তাদের কিছু নীতিবাগীশ মনে করে ও তাদের সাথে মন খুলে মিশতে পারে না। কিন্তু সবাই 'ঘর-পোড়া' থাকলে এসব বাধা থাকে না।

আমেরিকায় যদিও সুরাসক্তি ক্রমবর্ধমান তবু ওদেশে অ্যালকোহলিকস অ্যানোনিমাস (Alcoholics Anonymous ; বাংলায় 'অনামা আসবাসক্তের দল' ?) নামক অলাভজনক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এধরনের গোষ্ঠীচিকিৎসার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে এবং হাজার হাজার সুরাসক্তকে সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে এনেছে। এখন এটি একটি আন্তর্জাতিক সংস্থায় পরিণত হয়েছে, বিভিন্ন দেশে এর শাখা রয়েছে। এই সংস্থাটি কিছুটা ধর্মীয় মনোভাব সম্পন্ন। সদস্যদের প্রতি এর অন্যতম একটি নির্দেশিকা হল ঈশ্বরে বিশ্বাস। বাইবেলের একটি ঘটনার অনুসরণে (Sermon on the Mount) এদের নতুন সদস্যরা প্রথমেই চেষ্টা করে অন্তত ২৪ ঘণ্টা মদ ছাড়া থাকতে অভ্যস্ত হতে। ক্রমশঃ এ সময় বাড়ানো হয়। সদস্যদের বলা হয়, সকালে ঘুম থেকে উঠে আগামী ২৪ ঘণ্টা মদ না খেয়ে (sober) থাকার জন্য প্রতিজ্ঞা করতে। আগের সুস্থ জীবনে ফিরে আসার জন্য আকুতি, অন্যান্য সুরাসক্তকে সাহায্য করার শুভ ইচ্ছা, ঈশ্বরের সামনে

যৌথভাবে স্বীকৃতি (confession), সুরাপানে সুরাসক্ত ব্যক্তির দক্ষতা ক্ষমতা লোপ পাওয়া সম্পর্কে প্রচার ও সচেতনতা বাড়ান ইত্যাদি এঁদের ১২ ধাপের কর্মসূচীর অন্যতম।



অ্যালকোহলিকস অ্যানোনিমাস-এর সভা—কিছুটা যেন রহস্যময়

আমাদের দেশে এ ধরনের গোষ্ঠীগত প্রচেষ্টা খুবই সীমিত। তবু অ্যালকোহলিকস অ্যানোনিমাস-এর প্রায় ১০০টি গোষ্ঠী ভারতেও রয়েছে। এর মধ্যে ৫৫টিই রয়েছে বোম্বাইতে! (এটি বোম্বাই-তে মদ্যপানের ব্যাপকতাও নির্দেশ করে।) কলকাতার ফ্রী স্কুল স্ট্রীটে অ্যালকোহলিকস অ্যানোনিমাস-এর একটি শাখা গত প্রায় চার বছর ধরে চালু রয়েছে—এর সদস্য সংখ্যা প্রায় একশত। বাকী গোষ্ঠীগুলি আছে ব্যাঙ্গালোর, ম্যাঙ্গালোর, গোয়া, মাদ্রাজ, সেকেন্দ্রাবাদ, কোচিন, নাগপুর, পুনা, মহীশূর ইত্যাদি জায়গায়। আমেরিকার মূল গোষ্ঠীর মত এঁরাও প্রথমেই নতুন সদস্যকে দিয়ে এই স্বীকারোক্তি করান যে, "মদ খেয়ে আমরা অথর্ব

হয়ে পড়েছি, জীবন চলে যাচ্ছে আয়ত্তের বাইরে।" এঁরা বলেন, "অন্যদের উৎসাহিত করার সাথে সাথে আমরা নিজেদেরও মদের নাগালের বাইরে রাখার জন্য উৎসাহিত করি।" সুরাপায়ী ও সুরাসক্ত ব্যক্তি পুরো পরিবারেরই সমস্যা, একটি পারিবারিক রোগের মত। তাই এসব গোষ্ঠী পরিবারের লোকজনদের নিয়েও এ্যাল-এ্যানন (Al-Anon) নামে আলাদা গোষ্ঠী গড়ে তোলেন, তাঁদের সাথে আলোচনা করেন।

তবে কেউ কেউ এধরনের গোষ্ঠীতে সবার সঙ্গে আসক্তিমুক্ত হওয়ার জন্য ইচ্ছুক নাও হতে পারেন—বিশেষজ্ঞের দ্বারা নিজের চিকিৎসা করার জন্য আগ্রহী হতে পারেন। এ চিকিৎসায় মনোবিশেষজ্ঞের ভূমিকাও অনেকখানি, কারণ অধিকাংশ সুরাসক্ত ব্যক্তি মানসিক অস্বাভাবিকত্বে ভোগেন, মদ্যপান বন্ধ করার পরও যার লেশ প্রায়ই অনেকখানি থেকে যায়। এর জন্য উপযুক্ত চিকিৎসাকেন্দ্র, হাসপাতাল বা বিশেষজ্ঞের সংখ্যা আমাদের দেশে খুবই সীমিত।

ভারতে কমপক্ষে ৩০ লক্ষ সুরাসক্ত রোগী আছেন। তবে বস্তিতে, গ্রামে বা দেশের প্রত্যন্ত জায়গায় ছড়িয়ে আছে হিসাব বহির্ভূত আরো বহুজনই। এঁদের মধ্যে মাত্র ৩০০০ জন অর্থাৎ শতকরা মাত্র ০.০১ ভাগের জন্য চিকিৎসার ব্যবস্থা রয়েছে।

মাদ্রাজের টি.টি. রঙ্গনাথন ক্লিনিক্যাল রিসার্চ সেন্টার এ ধরনের চিকিৎসার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য একটি নাম। এর পরিচালিকা শ্রীমতী শান্তি রঙ্গনাথন। এঁর শিল্পপতি স্বামী সুরাসক্তির কারণে মারা যাওয়ার পর ভদ্রমহিলা আমেরিকায় গিয়ে প্রশিক্ষণ নেন এবং ফিরে এসে মাদ্রাজের স্যানথোম হাই রোডে নিজের বাড়ীতে সুরাসক্তির এই চিকিৎসাকেন্দ্র খোলেন। ১৯৮১ তে এখানে ৬২ জনের চিকিৎসা করা হয়, ১৯৮৫ তে ৩২০ জনের। সাফল্যের হার প্রায় শতকরা ৬০ ভাগ। মদ্যপানের কারণে সৃষ্টি হওয়া শারীরিক কষ্টগুলির প্রথমে চিকিৎসা করা হয়। কেউ বা জণ্ডিস, অজ্ঞান অবস্থা, তীব্র মনোবৈকল্য এসব নিয়ে ভর্তি হয়। এসবের চিকিৎসার পর সুরাসক্তির চিকিৎসা চলে। ঔষধ দিয়ে ও বিমুখী চিকিৎসা (aversion therapy)-র মত ব্যক্তিকেন্দ্রিক চিকিৎসার পাশাপাশি গোষ্ঠীগত চিকিৎসাও করা হয়।

এছাড়া বোম্বাই-এর কে. ই. এম. হাসপাতাল-এও চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। এখানে সাফল্যের হার প্রায় ৪৬%। ব্যাঙ্গালোরের ন্যাশন্যাল

ইনস্টিটিউট অব্ মেণ্ট্যাল হেল্থ্ এ্যাণ্ড নিউরোসায়েন্সেস দেখেছেন বিমুখী চিকিৎসা (aversion therapy)-র মাধ্যমে সেখানে সাফল্যের হার প্রায় ৪৫%। এ'রা আরো লক্ষ্য করেছেন বিবাহিত ও বয়স্ক সুরাসক্তদের মধ্যে সাফল্যের হার বেশি। পশ্চিমবঙ্গে এধরনের চিকিৎসার ব্যবস্থার কথা জানা নেই। এ রাজ্যের মেডিক্যাল কলেজ ও বড় হাসপাতাল গুলোতে সুরাসক্তি জনিত নানা রোগ নিয়ে বহু রোগীই ভর্তি হয়, কিন্তু সুরাসক্তি রোগের জন্য বিশেষ চিকিৎসা করার বিশেষজ্ঞ ব্যবস্থা নেই। কিছু কিছু সমাজসেবী সংস্থা, নার্সিংহোম ও ব্যক্তি উদ্যোগে গড়ে ওঠা চিকিৎসাকেন্দ্র তবু এ ব্যাপারে অতি সীমিত কিছু করার চেষ্টা করেন। আর অন্যত্র যেখানে ব্যবস্থা রয়েছে সেখানেও এই বিশেষ চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় বিশেষজ্ঞের অভাবও অনুভব করা যায়। তবে এ ধরনের ব্যয়সাধ্য চিকিৎসার সুযোগ নিতেও পারেন মুষ্টিমেয় কিছু ধনী লোক। আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের সাধারণ নানা রোগেরই উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই। স্পষ্টতঃ সুরাসক্তির চিকিৎসা তাঁদের কাছে সুদূর পরাহত। যে দারিদ্র্যও সামাজিক কারণে আমাদের দেশের অজস্র মানুষ নেশার শিকার হন সেই সব কারণে এই নেশা থেকে মুক্ত হওয়ার সুযোগও তাঁরা পান না—নিজের বা পরিবারের লোকজনের ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও।

বছর কুড়ি আগেও আমাদের দেশের মানুষের মধ্যে মদ্যপান যথেষ্ট সীমিত ছিল। কিন্তু এখন অতি দ্রুত হারে তা বাড়ছে, এমনকি গ্রাম-শহরের বহু তরুণ ও যুবকরাও নিয়মিত মদ্যপানে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। স্কুল-কলেজের বহু ছাত্রই এখন সুরার স্বাদ আস্বাদন করে, যা এই কিছুদিন আগে ভাবাই যেত না। এর পেছনে নানা কারণ রয়েছে, যেমন—

(ক) নানা ধরনের মদের সহজলভ্যতা—ব্যবসায়ীরা আইনের সাহায্য নিয়েই ছোট-বড় শহরে আইনী মদের দোকান খুলে বসেছে নিছক ব্যবসা করার জন্য। ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়ে উঠেছে লাইসেন্স যুক্ত মদের দোকান। এছাড়া বেআইনী দোকান আর দেশি মদের আখড়া তো রয়েইছে। বিদেশী অতিথিদের আপ্যায়ন করা বা বিশেষ কোন অনুষ্ঠানে নিতান্তই একদিনের জন্য, অতি সীমিত পরিমাণে সুরাপানে ইচ্ছুক বিশেষ কারো কারোর জন্য দু'একটি দোকান ছাড়া এ ধরনের আইনী-বেআইনী সমস্ত তথাকথিত ফরেন লিকার শপ বা ঠেক তুলে দেওয়া দরকার। মনে

রাখা দরকার হিরোইন বা ড্রাগের প্রসারের মত, মদের সহজলভ্যতা বাড়ার পেছনেও শুভ ও সুস্থ কোন ব্যাপার আদৌ নেই, একমাত্র যেটি রয়েছে তা হল ব্যবসা ও মুষ্টিমেয় কিছু জনের আর্থিক লাভ ও লোভ। আইনের শিথিলতা একে ক্রমশঃ বাড়িয়ে তুলেছে।

(খ) মূল্যবোধের অবক্ষয়, আদর্শহীনতা—নতুন প্রজন্মের মধ্যে এটিও বিচ্ছিন্নতা, হতাশা ও মানসিক অসুস্থতার অন্যতম বড় কারণ—যা-ও তাদের মদ, ড্রাগ বা এধরনের নেশার দিকে ঠেলে দেয়। চোখের সামনে এমন কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী নেই, যা তাদের ভরসা ও আস্থা অর্জন করতে পারছে। পুরনো সামন্ততান্ত্রিক নীতিবোধগুলি নষ্ট হচ্ছে, কিন্তু পরিবর্তে উন্নততর ও যথার্থ মানবতাবাদী নীতিবোধ গড়ে উঠছে না। এই শূন্যতার ফলে পুরনো যে সব ধ্যানধারণার জন্য মদ্যপান করাকে সংস্কার হিসেবে ধরেই পরিহার করা হত—তার বদলে সঠিক বৈজ্ঞানিক সচেতনতা গড়ে উঠছে না। এই বিজ্ঞানসম্মত সচেতনতার দ্বারাই একজন বুঝতে পারে যে—সংস্কারের জন্য নয়, নিজের শরীর, পরিবার ও সমগ্র সমাজের স্বার্থেই মদ্যপান বন্ধ করা দরকার।

(গ) সামাজিক বৈষম্য বৃদ্ধি—এর ফলে এমন লোকের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে, যারা অল্পায়াসে বেশ কিছু কাঁচা টাকা উপার্জন করছে। অন্য দিকে দরিদ্র, হতাশাগ্রস্ত, প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে থাকা লোকের সংখ্যাও আরো বেশি হারে বাড়ছে। উভয় দলেরই অনেকে বিলাসিতায় টাকা ওড়াবার জন্য কিংবা হতাশা থেকে মুক্তি পাবার সাময়িক দুরাশায় মদ ইত্যাদির নেশার আশ্রয় নেয়।

(ঘ) সাহিত্য সংস্কৃতির প্রভাব—সিনেমা-উপন্যাস বা অন্যান্য নানা তথাকথিত শিল্প-সাহিত্যকর্ম আমাদের দেশে এখনো মূলতঃ অবক্ষয়ী সংস্কৃতির প্রচার করে চলেছে। বাস্তবতার নামে বিকৃত রুচি, আত্ম-কেন্দ্রিকতার সৃষ্টি করছে। সমাজের প্রগতির স্বার্থে জনগণকে সমাজসচেতন করে তোলার জন্য, শাসকশ্রেণীর ধ্যান-ধারণায় পরিপুষ্ট মুষ্টিমেয়ের চেয়ে ব্যাপক সংখ্যক শোষিতশ্রেণীর সুস্থ মনোরঞ্জন ও সচেতনতার জন্য সাহিত্যকর্ম অতি নগণ্য। মদ্যপানকেও বেশ বাহাদুরির কাজ বা নায়কোচিত বলে উপস্থাপনা করা হয়। উন্নততর মানবিক গুণাবলীর বিকাশের চেয়ে, আদিম জৈব প্রবৃত্তিকে খুঁচিয়ে তোলার ক্ষেত্রে মদ-এর মত

জিনিষের নেশা আর তথাকথিত এ সব সাহিত্যকর্ম হাতে হাত দিয়ে টিকে আছে। বাংলাভাষাতেই মদ, গাঁজার নেশা ইত্যাদির ওপর বেশ কিছু জনপ্রিয় গান, সিনেমা ইত্যাদি রয়েছে। শিল্প ও এধরনের তথাকথিত সাহিত্যকর্মগুলিকেও বন্ধ করা দরকার।

(ঙ) বিশিষ্টদের উদাহরণ—শাসকশ্রেণীর স্বার্থে পরিপুষ্ট হওয়া, পচা-গলা 'সংস্কৃতি'র অংশীদার এই ধরনের কবি সাহিত্যিকদের অনেকেই যথেষ্ট সুরাসক্ত, উচ্ছৃংখল। এঁদের ব্যক্তিগত জীবনের এই বিকৃতিকে তরুণরা বিকৃতি বলে না চিনে প্রতিভা-বিকাশের অন্যতম উপায় বলে ভাবতে শেখেন সচেতন বা অবচেতন ভাবে। আমাদের দেশের এই সব বিকৃতমনারা অনেকেই পাশ্চাত্যের একই ধরনের কবি সাহিত্যিকদের দাস-সুলভ অনুকরণ করেই সৃষ্টি হয়েছেন। কিন্তু মদ খাওয়া, উচ্ছৃংখল বা বোহেমিয়ান জীবন যাপন করা ইত্যাদি যে প্রতিভা বা সৃষ্টিশীলতা বিকাশের শর্ত নয়, তা সমাজতান্ত্রিক দেশের কবি সাহিত্যিকদের উদাহরণ থেকে বা স্বদেশের-বিদেশের অন্য কিছু শিল্পী সাহিত্যিক, বিজ্ঞানীদের দেখে (সব ক্ষেত্রেই দু'একটি ব্যতিক্রম ছাড়া) বোঝা যায়। অনেক রাজনৈতিক নেতাও সুরাসক্ত। এদের দেখে শেখে তার অনুগতরা।

(চ) যৌথ জীবনের ও কাজের মানসিকতা হ্রাস—সমাজে সবার অংশ হিসেবে নিজেকে গণ্য করা ও সমগ্র সমাজের স্বার্থে নিজের কাজকে নিয়োজিত করার মানসিকতাও ধীরে ধীরে নষ্ট করা হচ্ছে। যৌথ পরিবার ভেঙে যাওয়া, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক তথা সুস্থ পারিবারিক সম্পর্কের অবনতি ইত্যাদি যেমন এর একটি দিক তেমনি অর্থনৈতিক সংকট, সামাজিক বিচ্ছিন্নতা ও অনিশ্চয়তা ইত্যাদি তার বৃহত্তর প্রেক্ষাপট। সামাজিক নানা কাজকর্ম যতক্ষণ ভাসাভাসা গা'ছাড়াভাবে থাকে অর্থাৎ নিছক সংস্কার-মূলক কিছু কাজকর্মের মধ্যে আবদ্ধ থাকে, ততক্ষণ বড়জোর তাকে সমর্থন দেওয়া হয়। কিন্তু যেই ত্যাগ স্বীকার করে, সমাজের সামগ্রিক সুস্থতর রূপান্তরের স্বার্থে কাজ করা হয়, তখনি নানা ছলে তাকে অবদমন করা হয়, নেমে আসে সমাজের স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে আইনের ও অত্যাচারের খড়্গ। শাসনে অধিষ্ঠিত রাজনৈতিক গোষ্ঠীর ছত্রচ্ছায়া ছাড়া অন্য কোন ধরনের সাংগঠনিক যৌথ কাজকেই সন্দেহের চোখে দেখা হয়। (অবশ্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকেও সমর্থন করা হয়—তার কারণ এটি

জানা আছে, এগুলি আর যাই হোক সমাজের অগ্রগতির ক্ষেত্রে কোন ভূমিকা রাখবে না, বরং সামাজিক প্রগতির রাশ টেনে রাখবে, তথাকথিত স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে সাহায্য করবে। এবং সর্বোপরি ঈশ্বর তথা ধর্মবিশ্বাস সংস্কারাচ্ছন্ন সংকীর্ণতা ও আত্মকেন্দ্রিকতা বাড়িয়ে তুলে শাসকশ্রেণীকে সাহায্য করবে।) যে দেশে শিল্পোদ্যোগ ও নানা উৎপাদনকে রাষ্ট্রায়ত্ত করার পরিবর্তে বিশেষ ব্যবসায়িক গোষ্ঠীদের হাতে তুলে দেওয়ার জাতীয় শিল্পনীতিই গ্রহণ করা হয়, সে দেশের সর্বস্তরেই যে এ ধরনের ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে প্রতিযোগিতাই নানাভাবে প্রতিষ্ঠিত করা হবে তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। তৈরী করা ব্যক্তিগত অর্থনৈতিক সংকট যৌথ সামাজিক কাজকে 'ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো'-র মত ব্যাপারে পর্যবসিত করে। স্বাভাবিক সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতনতা ধীরে ধীরে নষ্ট করা হচ্ছে। বাড়ান হচ্ছে পলায়নী মনোবৃত্তি। এসবের ফলেও আত্মকেন্দ্রিকতা ও বিচ্ছিন্নতা বাড়ছে, যা বিশেষত যুবসমাজকে নানা অসামাজিক কাজকর্ম, স্বার্থপরতা, নেশা ইত্যাদির দিকে ঠেলে দেয়।

সুরাসক্তি তথা নানা অসামাজিক, জনবিরোধী প্রবণতা দূর করার জন্য এসব কিছুকেই মাথায় রাখা দরকার। এগুলি তার সামাজিক চিকিৎসার নানা দিক। তবে স্পষ্টতঃই 'অর্ডার' দিয়ে এ ধরনের আদর্শ পরিমণ্ডল বানিয়ে ফেলা সম্ভব নয়। সমাজসচেতন ব্যক্তি ও সমাজ বিজ্ঞানীরা এসব নিয়ে চিন্তাভাবনাও করছেন, কিছু কাজকর্ম করছেন বা করার চেষ্টা করছেন। এটি স্পষ্ট যে, বর্তমানে যে ব্যবস্থা চলছে তার মধ্যে এর সমাধান সম্ভব নয়, বরং তা ক্রমশঃই বেড়ে চলবে।

তবু যতদিন না এধরনের পরিবেশ আসে ততদিন হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকাটাও কোন সুস্থ ব্যাপার নয়। কিছু আইন কানুন করা, ব্যাপক প্রচার চালানো অনায়াসেই করা যায়। এবং এগিয়ে আসতে হবে সাধারণ মানুষকেই।

সুরাসক্তির চিকিৎসায় ব্যক্তিবিশেষের চিকিৎসা, ব্যক্তিবিশেষদের নিয়ে গোষ্ঠী চিকিৎসা এবং সামাজিক চিকিৎসা—সবকিছুই জরুরী।

আইন কানুন করে ঢালাওভাবে মদের যোগান বন্ধ করা যায়। তবে এর জন্যও চাই আন্তরিকতা। ভারতের সংবিধানে মদ্যপানের বিরুদ্ধে মত দেওয়া আছে (Directive Principle of Constitution)। ভারতের

প্রাচীনতম রাজনৈতিক দল কংগ্রেস-এর নীতিমালাতেও তার সদস্যদের মদ্যপান নিষিদ্ধ করা আছে (All Codgressmen must abstain from all alcohol drinks)। তবু কংগ্রেস-এর সব সদস্যই মদ্যপানে বিরত—এমন দুর্নাম কেউ করতে পারবে না। একইভাবে দেশের সংবিধানকে সম্মান করার বোকামিও করা হয় না।

মদের ব্যবহার ও সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করে রাজ্য সরকার। এখন একমাত্র গুজরাটে সরকারীভাবে এর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। কিন্তু সেটি নেহাতই কাগজে কলমে—ওখানে সহজেই মদ পাওয়া যায়, সুরাপায়ী ও সুরাসক্তের সংখ্যাও যথেষ্ট। অনেক রাজ্যই মদের থেকে আয় করা শুল্ককে বেশ গুরুত্ব দেয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৮৭ সালের বাজেটে বিলিতি মদ, বীয়ার, দিশি মদ ইত্যাদির উপর শুল্কের হার বাড়িয়ে চলতি বছরেই ৭ কোটি টাকা বেশি আয় করার আশা করেছেন। কর্ণাটকে ১৯৮৫তে ৫০ কোটি টাকা এথেকে আয় হয়েছে। তামিলনাড়ুর মোট রাজস্বের শতকরা ৮ ভাগ আসে মদ থেকে। তামিলনাড়ু ও মহারাষ্ট্র সরকার বিভিন্ন সময়ে নিষেধাজ্ঞা জারী করেও একসময় নানা চাপে তা শিথিল করতে বাধ্য হন। বিহারে নিষেধাজ্ঞা জারী করার পর ধানবাদে প্রচুর মানুষ বেআইনী চোলাই খেয়ে মারা যায়, তারপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়।

স্পষ্টতঃ এ ধরনের নিষেধাজ্ঞা এই আর্থ-সামাজিক অবস্থার মধ্যে স্থায়ী সমাধান নয়। সাময়িকভাবে কেউ এক আধবার সীমিত পরিমাণে মদ খেতেই পারে। কিন্তু মনে রাখা দরকার, এটি অপ্রয়োজনীয় ও বিলাসিতার অঙ্গ মাত্র যেমন, তেমনি এ ধরনের অভ্যাসও সুরাসক্তির দিকে ঠেলে দিতে পারে—কমবেশী শারীরিক ক্ষতি তো করেই। সব মিলিয়ে মদের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তোলাটাই বড় কথা। বিভিন্ন রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকার এ ব্যাপারে কিছু কর্মসূচীও নেন। কিন্তু সেগুলি ঐ আইনকানুনের মতই। দূরদর্শনে বিজ্ঞাপন দেওয়া আর কিছু পোস্টার ছাপানোর মধ্যেই প্রায় সীমাবদ্ধ। কিছু শিক্ষিত মানুষের কাছে তা হয়তো পেঁছায়। কিন্তু মদ ও মদের নেশা যাদের প্রধান সমস্যা সেই বিপুল সংখ্যক দরিদ্ররা যে বিপদে সেই বিপদেই থাকে। আর সুরাসক্তির বিজ্ঞান সম্মত চিকিৎসার ব্যবস্থা তো নেহাতই নগণ্য।

আশু ব্যবস্থা হিসেবে, এই পরিবেশের মধ্যেই সচেতন গণআন্দোলনও

অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ—যেটি সামাজিক চিকিৎসার প্রয়োজনীয় একটি দিক। বিচ্ছিন্নভাবে নানা স্থানে তা করাও হয়। এ বছর মে মাসের শেষে কলকতার ফুলবাগানের স্থানীয় বাসিন্দারাই মদের তথা সমাজ বিরোধী কাজের আখড়া ভেঙ্গে দিয়েছে। উত্তরপ্রদেশ, বিহার, মধ্যপ্রদেশে এ ধরনের কিছু আন্দোলনে কিছু সুফল পাওয়া গেছে।

১৯৮৪ সালে উত্তরপ্রদেশের নৈনীতাল, আলমোড়া ও পিথরাগড় জেলায় এ ধরনের সুরাবিরোধী গণ-আন্দোলন উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করে। তার আগে ওখানে শতকরা ৯৫ ভাগ পুরুষই নিয়মিত সুরাপানে অভ্যস্ত ছিল এবং মদের দোকান ও শুঁড়িখানাগুলোর নিয়ন্ত্রণ করত স্থানীয় রাজনৈতিক নেতারা। বিশেষতঃ গরীব ও মধ্যবিত্ত পরিবারগুলি ক্রমশঃ ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, মাঝখান থেকে মুনাফা লুটছিল মুষ্টিমেয় দু'চারজন ব্যবসায়ী ও দালাল। মহিলাদের অবস্থা হয়ে উঠেছিল সবচেয়ে অসহায়। আর্থিক অনটন ও মানসিক নির্যাতন ছাড়াও মত্ত স্বামীর নির্মম প্রহার, গৃহবিবাদ এবং ধর্ষণ ও নারী নির্যাতনের মত সামাজিক অপরাধ চূড়ান্ত রূপ ধারণ করে। কি ঘরে, কি বাইরে মহিলাদের নিরাপত্তা ছিল না বললেই চলে। শিশু, কিশোর-কিশোরীরের অবস্থাও অনুমেয়। উত্তরখন্ড সংঘর্ষ বাহিনীর সাথে স্থানীয় মহিলারা ও পুরনো চিপকো আন্দোলনের কর্মীরা মিলে ছ'মাস ধরে ব্যাপক প্রচার, মিছিল, জোর করে মদের দোকান বন্ধ করে দেওয়া, মদ বাজেয়াপ্ত করে নষ্ট করা ইত্যাদির মত নানা কর্মসূচী গ্রহণ করেন। উল্লেখযোগ্য সাফল্যও আসে। আলমোড়া জেলা 'শুকনো' বা 'ড্রাই' হিসবে ঘোষিত হয়। সারা দেশে ছড়িয়ে থাকা টনিক ইত্যাদির মাধ্যমে যেমন মদ গেলান হয়, উত্তরপ্রদেশের ঐ সব অঞ্চলেও তা করা হত আরো ব্যাপকভাবে। পুদিনহারা নামের আয়ুর্বেদিক ওষুধ, অশোকা লিকুইড নামের এ্যালোপ্যাথিক ওষুধ ইত্যাদি তথাকথিত টনিক বিক্রি হত ঢালাওভাবে, এমনকি পানের দোকানে পাওয়া যেত, বই-এর দোকানেও বিক্রি হত—স্মৃতিশক্তি বাড়ানোর দাওয়াই হিসেবে (যেমন এখানে বিক্রি হয় ব্রেনোলিয়া)। কিছু এসব তথাকথিত ওষুধে মদ থাকত শতকরা ৭০ ভাগ পর্যন্ত। এগুলি পরীক্ষিত হতই না বলা যায়, কারণ ৮টি জেলার জন্য সরকারী ড্রাগ ইনস্পেক্টর ছিলেন একজন মাত্র। এ ধরনের ওষুধের ভয়াবহ ব্যাপক ব্যবহারের আঁচ পাওয়া যাবে শুধু একটি জেলার পরিসংখ্যান থেকে

—এখানে প্রতি মাসে ১২৫০০টি এ ধরনের ওষুধের বোতল খেতেন শুধু গর্ভবতী মহিলারা। সব মিলিয়ে যকৃতের ও পাকস্থলীর রোগ ও মদের কারণে অন্যান্য অসুখগুলি ভয়াবহ ভাবে বেড়ে চলছিল। আলমোড়া জেলার হরগোবিন্দ পন্থ হাসপাতালে শতকরা ২৫জন রোগীরই রোগের কারণ ছিল মদ্যপান। অবস্থা এমন একটা পর্যায়ে পেঁছিয় যে রাণীক্ষেতের সরকারী কো-অপারেটিভ ওষুধ কারখানাতেও মদ তৈরী হত। আন্দোলনের ফলে সব অবস্থাটাই অনেকটা পাল্টে যায়। গরীব মানুষেরা বিপুল সংখ্যায় মদ্যপান বন্ধ করে বা কমিয়ে দেয়। সামাজিক-পারিবারিক শান্তি ফিরে আসে। বাখালি গ্রামের তরুণী বীণা কালপালের কথায় "স্ত্রী নির্যাতন এখন অতীতের ব্যাপার। আগে আমাদের উপর প্রতিদিনই নির্যাতন চলত, আমাদের জীবন কখনোই সুখের ছিল না।" ঘুনগোলী গ্রামের প্রৌঢ়া হেমাদেবীর ভাষায় "মদের বিরুদ্ধে আন্দোলন ভবিষ্যৎ বংশধরদের রক্ষা করতে পারবে। কেবলমাত্র একজন মহিলাই ভালভাবে বুঝতে পারেন কিভাবে মদ্যপ স্বামী তার স্ত্রী ও ছেলে-মেয়েদের আর্থিক ও মানসিক নির্যাতন করে।" ছাউকাতিয়া গ্রামের একদা সুরাসক্ত যুবক নরেন্দ্র সিং মদ সম্পূর্ণ ছেড়ে দিয়ে নিজেই তার বিরুদ্ধে প্রচারে নেমেছে, নিজের জীবনের অতীত দুরবস্থার কথা তুলে ধরেছে, গণ-স্বাক্ষর সংগ্রহ করে সরকারের কাছে পাঠিয়েছে মদ ও তথাকথিত ওষুধের বিক্রির বিরুদ্ধে। আন্দোলনকারীরা প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা দামের মদ ও ঐসব নকল ওষুধ নষ্ট করে দিয়েছেন।

কিন্তু এ আন্দোলন যে বাধাহীনভাবে হয়েছে তা নয়। কারণ মদের মাধ্যমে স্থানীয় জনগণকে শোষণ করা ও মুনাফার পাহাড় গড়ার জন্য কায়েমী গোষ্ঠী অভ্যস্ত ছিল। আন্দোলনকারীদের ভাষায় "জনগণকে এমন নেশায় বুঁদ করে রাখা হত, যাতে তারা নিজেদের আসল সমস্যা সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা না করতে পারে এবং সুস্থ জীবনের জন্য নিজের অধিকার আদায় ও প্রতিষ্ঠা করার জন্য সচেষ্ট না হয়।"

স্বাভাবিকভাবেই প্রতিরোধ আসে। ব্যবসায়ীরা ও কায়েমী স্বার্থ সহজে তাদের ক্ষতি মেনে নেয়নি। তবে দুঃখের ও লজ্জার হল এক্ষেত্রে নেতৃত্ব দেয় রাজ্যের ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের স্থানীয় নেতা ও সমর্থকেরা। এই দলের আলমোড়া জেলার সাধারণ সম্পাদক চন্দ্রশেখর পাণ্ডে এ ধরনের নেতাদের একজন। 'জনসংঘর্ষ সমিতি' নামে এক সংগঠন

তাঁর নেতৃত্বে মদ্যপান বিরোধী আন্দোলনের বিরুদ্ধে সক্রিয় হয় এবং নির্লজ্জের মত তিনি এও মন্তব্য করেছেন যে, "কিছুটা বাধ্য হয়েই আমাকে এ সমিতি তৈরী করতে হয়েছে, কারণ গরীব মানুষেরা আমাকে বলেছে—মদ না খেতে পেলে তারা মরে যাবে।" আসলে স্থানীয় সুরাব্যবসা প্রায় সম্পূর্ণটাই নিয়ন্ত্রণ করত এই রাজনৈতিক দলের কর্মীরা। আলমোড়া জেলার ভিখিয়ানশানের শাসকদলের স্থানীয় কোষাধ্যক্ষ নন্দন সিং-এর বাড়ী ঘেরাও করে ২৫০০ বোতল মদ উদ্ধার করে আন্দোলনকারীরা। আরেক নেতা রুদ্রমালি লোকচোরার গোপন ভাণ্ডারে ৩০০০ বোতল মদের সন্ধান পাওয়া যায়।

এইভাবেই হতাশা ও শোষণের জাল কেটে স্থানীয় মানুষ নিজেদের সুস্থতর জীবনের আলো দেখতে পায়। সবচেয়ে বড় দিক হল, নিষ্ক্রিয়ভাবে চারপাশের ষড়যন্ত্রের শিকার না হয়ে তারাও যে নিজেদের পায়ে দাঁড়িয়ে নিজেদের জীবনকে উন্নত করতে পারে—এ ব্যাপারে সচেতনতা ও আস্থা অর্জন।

উত্তরপ্রদেশের উপরোক্ত এই আন্দোলনের বিবরণ ও তথ্যাদি সংগ্রহ করা হয়েছে ইণ্ডিয়া টুডে (১৫-৯-৮৪) থেকে। এটি একটু বিস্তারিতই বলা হল—শরীর ও সমাজে সুরার সর্বনাশা প্রভাব এবং তার বিরুদ্ধে গণ-আন্দোলনের সাফল্যের দিকটি অর্থাৎ সামাজিক চিকিৎসার কিছু আভাস দেওয়ার জন্য। এ ধরনের আন্দোলন আরো কিছু কিছু হয়েছে। ১৯৭৯ সালে মধ্যপ্রদেশের রাজহরা খনি এলাকাতেও শ্রমিকদের মধ্যে মদের একই ধরনের সর্বনাশা ব্যাপকতার বিরুদ্ধে দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন করে সফল হওয়া গেছে। মদ্যপায়ী শ্রমিকদের শতকরা ৯৫ ভাগই মদ ছেড়ে দিয়েছেন, বাকীরা খান লুকিয়ে চুরিয়ে। মদ বানানোর কারখানাটিও রাজহরা থেকে হটে গেছে, যদিও তার মালিক স্থানীয় এম. এল. এ. ইত্যাদির সাহায্যে আন্দোলনের নেতাকে গ্রেপ্তার করা থেকে শুরু করে নানা পন্থাই অবলম্বন করেছিল।

ঘটনাচক্রে এখানে উত্তরপ্রদেশের ঘটনায় বিশেষ একটি রাজনৈতিক দলের কর্মীরা মদ্যবিরোধী গণ-আন্দোলনের বিরুদ্ধে জড়িত আছেন। এ ধরনের উদাহরণ আরো রয়েছে। উল্টোভাবে অতীতে ও বর্তমানে এই দলের অনেক সাধারণ কর্মী সর্বনাশা সুরার বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছেন ও করে চলেছেন।

মণিপুরে মহিলারাই সংগঠিত হয়ে এগিয়ে এসেছিলেন। রাত্রিবেলা শুঁড়িখানার সামনে তাঁরা পাহারা দিতেন, মাতাল কাউকে বেরুতে দেখলেই হাতে নাতে ধরে গলায় বোতলের মালা ঝুলিয়ে দেওয়া হত আর প্রকাশ্যে হাঁটিয়ে অপমান করা হত। এতে সাময়িক হলেও উপকার হয়েছে।

সারা দেশ জুড়ে এ ধরনের আন্দোলনের জন্য প্রয়োজন জনগণের ব্যাপকতর সচেতনতা—শরীর ধ্বংস করার সাথে সাথে মদ কিভাবে মূল্যবোধ, সৃজনশীলতা, যৌথ সংগঠিত কাজের মানসিকতা ধ্বংস করে এবং দারিদ্র্য ও শোষণের জালে আটকে ফেলে, সে সম্পর্কে ও তার বিরুদ্ধে সচেতনতা। চীনের ঐ ঐতিহাসিক আফিম যুদ্ধের* পুনরাবৃত্তি কি এখানে আসন্ন ?

---

* গত শতাব্দীর শুরুর দিকে ব্রিটিশ সিংহ চীনের দিকে তার থাবা বাড়ায়। বিপুল পরিমাণ আফিম আমদানী করতে থাকে—আফিমের ব্যবসার সাথে চীনের মানুষকে নেশায় বুঁদ করে রাখাও ছিল উদ্দেশ্য। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অনুগ্রহপুষ্ট ভারতীয়রাও এ ব্যবসার অংশীদার হয়। চীন সরকার আফিম আমদানীর বিরুদ্ধে রুখে দাড়ালে ব্রিটেন ১৮৪০ সালে কোয়াংতুং আক্রমণ করে। ১৮৪০-৪২ জুড়ে যুদ্ধ এটিই আফিম যুদ্ধ। চীনের বন্দরে প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর ও অন্যান্যদের আফিম ভরা জাহাজ জ্বড়ে ছারখার হয়। অবশেষে দুর্নীতিগ্রস্ত চীন সম্রাট ব্রিটিশদের সাথে অসম চুক্তি করে দেশকে সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে বিকিয়ে দেয়, যুদ্ধ থামে। পরে চীনের কমুনিস্ট পার্টি ও ১৯৪৯ সালে মুক্তির পর নতুন চীনের সরকার সবধরনের নেশার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন। এখনো এটি মোটামুটি সফল। এর পেছনে সমাজব্যবস্থা ছাড়াও শারীরিক কারণও থাকতে পারে—কারণ চীনাদের মত ইহুদীদের মধ্যেও সুরাসক্তি বিরল।

সুরা ও আইন

সুরা সংক্রান্ত বিধিনিষেধ বা আইন কানুনের ইতিহাস অতি পুরনো —অন্তত আমাদের দেশে।

মনুসংহিতায়* সুরাপানকে মহাপাতকী কাজ বলে বলা হয়েছে—তবে এটি শুধু 'দ্বিজাতি' অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। বলা হয়েছে "ব্রাহ্মণঘাতী, সুরাপায়ী দ্বিজাতি, সুবর্ণ অপহরণকারী ও গুরুপত্নিগামী—ইহাদের প্রত্যেককে মহাপাতকী বলিয়া জানিবে।" এবং "সুরা অন্নের মল, মলকেই পাপ বলে; এ কারণ ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যের সুরাপান করা উচিত নয়। গুড় রচিত গৌড়ী, পিষ্ট নির্মিত পৈষ্টী, মধু হইতে মাধ্বী—সুরা এই ত্রিবিধ। ইহার একটিও যেমন, সকলগুলিই সেইরূপ। দ্বিজোত্তম ব্রাহ্মণগণ ইহা পান করিবেন না। নববিধ মদ্য, মাংস, ত্রিবিধ সুরা এবং আসব অর্থাৎ সদ্যোজাত এই সকল যক্ষ, রাক্ষস ও পিশাচদিগের পেয়, একারণ উহা দেবান্নভোজী ব্রাহ্মণের কদাচ ভক্ষণ করা

---

* মনুসংহিতা প্রাচীন ভারতীয় সমাজের তথা বহিরাগত আর্যদের বৈদিক সভ্যতার, বিশেষত চাতুর্বর্ণিক সমাজের ধর্ম নিরূপণ বা কর্তব্য নির্ণয়ের শাস্ত্র। ব্রহ্মার কাছ থেকে শিখে মনু তাঁর শিষ্য ভৃগুর মাধ্যমে এর প্রচার করেছেন বলে কথিত থাকলেও এখনকার মনুস্মৃতি প্রকৃতপক্ষে কোন বিশেষ ব্যক্তির রচনা নয়। এর সংকলনের আনুমানিক সময় খ্রীষ্টপূর্ব ১০০০ সাল বা তার কিছু আগে-পরে। (পি. ভি. কানে তাঁর History of Dharmasastra-এ অবশ্যি রচনাকাল বলেছেন ২০০ খ্রীষ্টপূর্ব থেকে ২০০ খ্রীষ্টাব্দ।) বৈদিক যুগের সময়কাল আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ২৫০০ থেকে ৬০০ সাল—এ যুগ প্রথমে দাসব্যবস্থার যুগ, পরে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার। বৈদিক যুগের শুরুর দিকে চতুর্বর্ণ প্রথা ছিল না, পরে এর সৃষ্টি এবং ঐ সময়েই তৎকালীন শাসকশ্রেণী মনুসংহিতার মত আইনের বই তৈরী করে। (ভারতীয় সমাজ পদ্ধতি, ১ম খণ্ড, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, ১৯৮৩ এবং বিজ্ঞানের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, সমরেন্দ্র নাথ সেন, ১৯৬২)।

উচিত নয়। ...যাঁহার করগত ব্রহ্ম একবারও মদ্য দ্বারা আপ্লাবিত হয়, তাঁহার ব্রাহ্মণ্য দূরীভূত হয় এবং তিনি শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হন।"

সুরাপানের শাস্তি হিসেবে বলা হয়েছে কপালে "সুরাপাত্রচিহ্ন তপ্ত লৌহ" দ্বারা চিরকালের জন্য এঁকে দেওয়া। তবে প্রায়শ্চিত্ত করলে "ললাটে ঐ চিহ্ন অংকিত করিতে হইবে না।" কিন্তু এ প্রায়শ্চিত্ত সোজা নয়। "ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য—জ্ঞানপূর্বক সুরাপান করিলে, ঐ পাপক্ষয়ার্থ অগ্নিবর্ণ জ্বলন্ত সুরাপান করিবে—ঐ সুরার দ্বারা শরীর একেবারে দগ্ধ হইলে তবে পাপের নিষ্কৃতি হয়।" আর "সুরাপান করিলে গোরুর লোম বিরচিত বস্ত্রধারী, জটাবান, এবং সুরাপাত্র চিহ্নে চিহ্নিত হইয়া খুদ বা তিলের খইল সংবৎসর পর্যন্ত একবার মাত্র রাত্রে ভোজন করিবে। এইরূপ করিলে পাপ-মুক্ত হয়" ইত্যাদি।

স্পষ্টতঃই সুরা যে ব্যক্তি বিশেষের শরীর ও মনকে ধ্বংস করে এ বোধ ছিল বলেই সুরাপান সম্পর্কে এ ধরনের কঠোর অনুশাসনের সৃষ্টি করা হয়েছে। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে সমাজের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে সুরাপানের ব্যাপক বর্ণনা পাওয়া গেলেও পরবর্তীকালে সুরাপান সম্পর্কে এ ধরনের নির্মম নির্দেশের সামাজিক প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয় বলেই এসবের সৃষ্টি। তবে এ প্রসঙ্গে মনুসংহিতায় এ ধরনের নির্দেশাবলী থেকে আরেকটি দিকও স্পষ্ট হয়। মনুসংহিতা স্পষ্টতঃই ছিল শাসকশ্রেণীর স্বার্থরক্ষাকারী সংবিধান। ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যরা ছিল এই শাসক শ্রেণীর অংশ। বিপুল সংখ্যার ও সংখ্যাগরিষ্ঠ দাস বা শূদ্রদের মধ্যে কিন্তু পরিমিত বা অপরিমিত সুরাপানকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করা হয় নি। সুরার প্রভাবে সৃজনশীলতা, ব্যক্তিত্ব, মূল্যবোধ—সবকিছুরই অবনমন ঘটে। এটি সম্যকভাবে উপলব্ধি করেই যথাসম্ভব দাসেদের মধ্যে সুরাপান যাতে টিকে থাকে তার জন্য পরোক্ষভাবে যত্ন নেওয়া হয়েছে। এর ফলে দাসেদের দাসত্ব সুনিশ্চিত হবে এটি ছিল নিশ্চিত একটি ধারণা। অথচ মনুসংহিতার ছত্রে ছত্রে রয়েছে, কিভাবে নানা ধরনের অপরাধের জন্য শূদ্র বা দাসেদের শাস্তির বহর বা প্রায়শ্চিত্তের কঠোরতা অন্য তিন বর্ণের চেয়ে অনেক অনেক বেশি ছিল—বিশেষত সেই সমস্ত অপরাধের জন্য শাস্তি, যেগুলি, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যদের স্বার্থ ও অস্তিত্বকে কোনভাবে বিঘ্নিত করে। এই পরিপ্রেক্ষিতে শূদ্র ছাড়া অন্যদের মধ্যে সুরাপানকে

'মহাপাতকী' বলে নিয়ন্ত্রণ করার আপ্রাণ চেষ্টা স্পষ্টতঃই শাসককুলকে রক্ষা করার স্বার্থেই করা। এখন মনুর আমলের ঐ 'চারিবর্ণ' আর নেই, সৃষ্টি হয়েছে নতুন শ্রেণী ও শ্রেণী সম্পর্ক। কিন্তু মূল ব্যাপারটি একই রয়েছে—সুরার প্রসঙ্গেও যেমন, শাসককুল সর্বদাই শোষিত শ্রেণীর মধ্যে এ ধরনের নেশাকে নানা কায়দায় টিকিয়ে রাখতে সচেষ্ট আছে। অবশ্যই তা বলে কয়ে নয়, নানা সূক্ষ্ম কৌশলে। তবে আশার কথা শোষিত শ্রেণীও ক্রমশঃ সক্রিয় ও সচেতন হয়ে উঠছে। দীর্ঘকাল ধরে আমাদের দেশে মনুসংহিতার এ ধরনের নানা নির্দেশাবলীই সামাজিক অনুশাসন হিসেবে স্বীকৃত ছিল—হয়তো বা সামান্য কিছু হেরফের করে। মুসলিমদের মধ্যে ছিল কোরআন শরিফের নির্দেশ। ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের অনুসরণীয় কোরআন শরীফে বলা আছে, "লোকে তোমাকে মদ ও জুয়া সম্বন্ধে প্রশ্ন করে, বল, উভয়ের মধ্যে মানুষের জন্য মহাপাপ এবং উপকারও রহিয়াছে; কিন্তু উহাদের পাপ উপকার অপেক্ষা গুরুতর।"..."মদ, জুয়া, মূর্তি এবং তীর এইসব অতি অপবিত্র শয়তানের কাজ, অতএব উহা হইতে মুক্ত থাক, তবেই তোমরা মুক্তি পাইবে।" ইত্যাদি (কোরআন শরীফ, অধ্যক্ষ আলী হায়দর চৌধুরী অনূদিত; ঢাকা, ১৯৭৮) (কোরআন শরীফের একেবারে শুরুর দিকে মদকে এইভাবে হারাম বা নিষিদ্ধ করা হয়নি, এটি পরবর্তীকালের নির্দেশ। ঐ, পৃঃ ৭১)।

অবশ্য উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরাই এসব নির্দেশকে হুবহু মেনেছে তা নয়। আর এ ধরনের ধর্মপুস্তক তথা তথাকথিত ধর্মের আওতা থেকে বের করে সরকারি নানা আইনকানুন রচনা এই হাল আমলের।

এসব আইনকানুনও আমাদের দেশে হঠাৎ করে হয় নি। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ শুরুতে এদিকে নজর দেওয়ার কোন প্রয়োজন অনুভব করে নি। কিন্তু সাহেবদের অনুকরণে ব্যাপক সুরাপান এবং তার শারীরিক-পারিবারিক-সামাজিক ভয়াবহ কুফল দেখে দেশেরই কিছু সচেতন মানুষ উদ্যোগী হন সুরা-নিবারণী আন্দোলন করতে, যা পরবর্তীকালে ব্রিটিশ সরকারকে বাধ্য করে এ সম্পর্কে আইনকানুন-বিধিনিষেধের সৃষ্টি করতে।

ঊনবিংশ শতকের প্রথম ২০-৩০ বছর সময়কালে ব্রিটিশ আমলে বাংলাদেশে চিন্তাভাবনা, শিক্ষা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নতুন ভাবনার কিছু জোয়ার আসে। ঐ জোয়ারে পুরনো ধ্যান-ধারণাকে ভেঙে নতুন কিছু গড়ার

লাগামছাড়া উদ্যম নিয়ে বেশ কিছু জন এগিয়ে যান। এঁরা সুরাপানকে পুরনো সংস্কার ভাঙার অন্যতম প্রতীক হিসেবে নিয়েছিলেন। মনু-সংহিতা ও তার অনুসারী হিন্দু আচার-অনুষ্ঠানকে ভাঙার মধ্য দিয়ে নতুন চিন্তার সৃষ্টি করা ছিল এদের উদ্দেশ্য। 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ'-এ শিবনাথ শাস্ত্রী মন্তব্য করেছেন, "সে সময়ে সুরা-পান করা কুসংস্কার ভাঙনের একটা প্রধান উপায় ছিল। যিনি শাস্ত্র ও লোকাচারের বাধা অতিক্রম পূর্বক প্রকাশ্যভাবে সুরাপান করিতে পারিতেন, তিনি সংস্কারক দলের মধ্যে অগ্রগণ্য ব্যক্তি বলিয়া পরিগণিত হইতেন।" আবেগ সর্বস্ব ও ভাঙার-জন্য-ভাঙার উদ্দেশ্যে সৃষ্টি হওয়া এসব ঝোঁকের পরিণতি কি হয়েছে তা আমরা জানি। মনুসংহিতার মত শাস্ত্রের বাধা অতিক্রম করে সংস্কারক হওয়ার জন্য, মদ খাওয়ার প্রবণতাও দেখা দিয়েছে ঐ ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য বর্ণোদ্ভূতদের তথা শাসকশ্রেণীর প্রতিভূদের মধ্যেই—কারণ এদের জন্যই মদ্যপানকে অশাস্ত্রোচিত করা হয়েছিল। নিম্নবর্ণের মানুষদের মধ্যে এভাবে সংস্কারক হওয়াটা আদৌ প্রাসঙ্গিক ছিল না।

তবে পরবর্তীকালে এঁদেরই কেউ কেউ এগিয়ে আসেন মদ্যপান নিবারণে আন্দোলন সংগঠিত করতে, যেমন রাজনারায়ণ বসু। তিনি ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দে এ উদ্দেশ্যে একটি সভা করেন মেদিনীপুরে। অনেকের মতে এটিই ছিল বাংলাদেশে এ জাতীয় প্রথম প্রকাশ্য সভা। (তবে তার আগে মিশনারীরা এ ধরনের কিছু সংস্থা তৈরির উদ্যোগ নিয়েছেন।) এর আগে রামমোহন রায়ও মদ্যপান নিয়ন্ত্রণের কথা বলেছেন, কিন্তু সম্পূর্ণ বন্ধ করার পক্ষপাতী তিনি ছিলেন না। অন্যদিকে রাজনারায়ণ বসুর মতে "পরিমিত পান করা মানে একটি ছিদ্র রাখা,"—তাই তিনি সম্পূর্ণভাবে মদ্যপান নিয়ন্ত্রণের কথা বলেছিলেন। পরে ১৮৬৪-তে প্যারীচরণ সরকারের নেতৃত্বে (সম্পাদক হিসেবে) ও নীলমণি চক্রবর্তী, হরলাল রায় প্রমুখের সহযোগিতায় বঙ্গীয় মাদক নিবারণী সমাজ (The Bengal Temperance Society) প্রতিষ্ঠা হয়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাধাকান্ত দেব, ইত্যাদিরা ছিলেন এর সদস্য-পৃষ্ঠপোষক। এর অনুকরণে চারদিকে ৬৪ টি ভ্রাতৃত্ব-মূলক সমিতি গড়ে ওঠে। উত্তরপাড়ায় হিতকরী সভার শাখা হিসেবে উত্তরপাড়া মাদক নিবারণী সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। সুরাপানের ভয়াবহ প্রভাব ও আইনের শাসন না থাকার ফলে তার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি দেখে

এ ধরনের সংগঠনগুলি সামাজিক প্রতিক্রিয়া হিসেবে গড়ে ওঠে। 'বঙ্গীয় মাদক নিবারণী সমাজ'-এর সভার মন্তব্য স্মরণ করা যায়—যা এখনো প্রাসঙ্গিক—"মাদক সেবন দেশব্যাপী হইয়া দুষ্ক্রিয়া, দৈন্য, ব্যাধি ও অধঃপতন ভয়াবহ পরিমাণে উৎপন্ন করিতেছে ; রাসায়নিক বিশ্লেষণ, শরীর-তত্ত্ব, বৈজ্ঞানিক তথ্য, শত শত মহাযশস্বী ভিষকগণের অভিমত এবং নানা দেশীয় বহু দর্শন অভ্রান্তরূপে প্রমাণ করিয়াছে যে, স্বাস্থ্যে বা পীড়ায়, খাদ্য বা অম্লরূপে, ক্ষুন্নিবারণ বা বিলাসিতার জন্য, শ্রমক্লিষ্ট দেহ বা মনের পরিপুষ্টি করণার্থে, রোগ নিবারণের বা আয়ুবর্ধনের উপায় স্বরূপ, কোনপ্রকার প্রমত্তকারী পানীয়ের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, প্রত্যুত উহা দুষ্ক্রিয়া, দুঃখ, পীড়া ও মৃত্যুহননের অত্যুব্বর্বর ক্ষেত্র স্বরূপ ; সুরা একটি তীব্র বিষ, এবং উহার অল্প মাত্রার ব্যবহারও অনিষ্টকারী ; সর্বদেশে বিশেষতঃ এদেশে দৃষ্ট হইয়াছে যে মদিরার পরিমিত পানই অধিকাংশ স্থলে ঘোরতর পাশব প্রমত্ততার প্রথম সোপান স্বরূপ হয় ;—এই সকল কারণে সর্বপ্রকার মদ্যপানে বিরতির অভ্যাস গ্রহণ ও প্রবর্তনের এবং সুরাপানের বিষময় ফল সপ্রমাণিত ও প্রকাশিত করিবার উদ্দেশ্যে, যাবতীয় দেশহিতৈষী ব্যক্তিবর্গের সমবেত উদ্যম আবাহন করিয়া 'বঙ্গীয় মাদক নিবারণী সমাজ' (Bengal Temperance Society) নামে একটি সমিতি গঠনের প্রয়োজন হইয়াছে।" (নবকৃষ্ণ ঘোষ-এর লেখা 'প্যারীচরণ সরকার', ১৮৭৯।) পরবর্তীকালে এই 'প্রয়োজন' অনুভব করে কেশবচন্দ্র সেনও মদ ও অন্যান্য মাদকদ্রব্য নিবারণী আন্দোলন গড়ে তোলেন। ১৮৭০-এ প্রতিষ্ঠিত ভারত সংস্কার সভা ও ১৮৭৮-এ প্রতিষ্ঠিত আশালতা দলের মাধ্যমে দীর্ঘদিন তিনি এ আন্দোলন চালান।

এ ধরনের নানা আন্দোলন সত্ত্বেও শাসক ইংরেজ মদ্য নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত আইন তথা আবগারি আইন তৈরি করতে যথেষ্ট টালবাহানা করে। "১৭৭২ শকাব্দের শ্রাবণ মাসের ৮৪ সংখ্যা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে মদ্যপানের ক্রমবৃদ্ধির জন্য অর্থলোভাতুর রাজাকে দোষী করা হয়েছিল। অনুকরণপ্রিয় বাঙালীও যে মদ্যপান বৃদ্ধির জন্য দায়ী তাও বলা হয়েছিল। পত্রিকাটি মদ্যপান নিবারণের জন্য শাসক কর্তৃপক্ষকে মদ্য ব্যবসায় বন্ধ করবার আবেদন জানিয়েছিল। কিন্তু বলা বাহুল্য শাসকগোষ্ঠী তত্ত্ব-বোধিনী পত্রিকার সে আবেদনে সাড়া দেন নি। সেই সময় মাদক দ্রব্যের

নিয়ন্ত্রণে 'ভারত সভার' সদস্য এবং মিশনারীগণও সচেষ্ট ছিলেন। কোম্পানীর নতুন সনদ পাবার আগে এদের তরফ থেকে আবেদন করা হয়েছিল, ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী যেন মাদক দ্রব্যের ব্যবসায়ে উৎসাহ না দেন, কিন্তু ইংলণ্ডের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সে আবেদনে সাড়া দিতে চান নি। অথচ মদ্যপান নিবারণের ক্ষেত্রে সরকারী সহায়তারই বড় প্রয়োজন।" (ডঃ অজয়েন্দ্রনাথ সরকারের লেখা 'ঊনিশ শতকের সমাজ সংস্কার আন্দোলন ও বাংলা বিতর্ক রচনা' ; ১৯৮২) *

মনু-র মত ইংরেজ সরকার আর ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীও সার বুঝেছিল যে, এদেশে তাদের শাসন প্রতিষ্ঠিত করতে, আর্থিক লাভ বাড়িয়ে তুলতে মদও একটা বড় মাধ্যম—এদেশীয় কিছু তাঁবেদারদের ভুলিয়ে রাখতে, সাধারণ মানুষকে বিপথগামী করতে তা বেশ সাহায্য করবে। এছাড়া সরাসরি মদ-ব্যবসার লাভ তো আছেই।

তবু নানাদিক থেকে চাপ আসতে থাকার ফলে ধীরে ধীরে মাত্র ১৮৭৫ সালে আবগারি আইন তবু কিছুটা তৈরি হয়। তার আগে ডাক্তারখানায় মদ বিক্রি হতো। 'বঙ্গীয় মাদক নিবারণী সমাজ' দাবি জানায় যে ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন ছাড়া ওষুধ দোকানে মদ বিক্রি করা চলবে না। "বহু চেষ্টার পর গভর্নমেন্ট পরিশেষে" এ দাবি মেনে নেন (Section 43 of Act VII of 1875)। কেশবচন্দ্র সেনেরও বহু আবেদন নিবেদনে আংশিক সাড়া দিয়ে মাদক দ্রব্যের অঢেল ব্যবহারের উপর কিছু বিধিনিষেধ জারী করা হয়।

শুধু বাংলাদেশে নয়, ভারতবর্ষের নানা স্থানেও এ ধরনের আন্দোলন গড়ে ওঠে। পরবর্তীকালে কংগ্রেসও মদ্যপান বিরোধী কর্মসূচী গ্রহণ করে ; তাদের সংবিধানে কংগ্রেসীদের জন্য মদ্যপান নিষিদ্ধ করা হয়। ব্রিটিশ সরকার ১৯০৯ সালে পূর্ণতর আবগারি আইন রচনা করে—যার অনুসরণ, কিছু পরিবর্তনসহ, স্বাধীন ভারতবর্ষেও চলে আসছে।

তবে বর্তমানে ভারতের সংবিধানেও সুরাপান না করার জন্য নির্দেশ (Directive Principle**) দেওয়া হয়েছে। অবশ্য এ নির্দেশও নিছকই কথার কথা বলেই মনে হয়। দেশে মদের ব্যবহার চালু থাকবে বা রাখা

---

* এই অংশের অন্যান্য কিছু তথ্যও এ বই থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।

** ভারতের সংবিধানের এ অংশটি আয়ার্ল্যাণ্ড থেকে ধার করা।

হবে এবং তার থেকে বিপুল পরিমাণ সরকারি আয় হবে,—এটি ধরে নিয়েই, তার জন্য আইন করা হয়েছে এবং এ সংক্রান্ত আইনকানুন তৈরি করা, কার্যকরী করা ইত্যাদির মূল দায়িত্ব রাজ্য সরকারের উপর অর্পণ করা হয়েছে। স্বাধীনভারতের প্রায় সব আইনের মত সুরা সংক্রান্ত তথা আবগারী আইনকানুনগুলি মূলত ব্রিটিশ আমলে তৈরি। তার পরে নানা সময়ে এর খুঁটিনাটি কিছু পরিবর্তন করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গেও এ ধরনের আইনকানুনের মূল কাঠামো ঐ বেঙ্গল এক্সাইজ অ্যাক্ট, ১৯০৯। (এখানে এই আইনের কিছু অংশ তুলে দেওয়া হল। স্পষ্টতঃই আইনের সম্পূর্ণ পুস্তিকাটির অনুবাদ এখানে দেওয়া সম্ভব নয়—ভাষার খুঁটিনাটির দিক থেকেও কিছু অসম্পূর্ণতা থেকে যাওয়াটাও স্বাভাবিক। এ সম্পর্কিত আইনকানুনের একটি প্রাথমিক পরিচয়ই দেওয়া হয়েছে মাত্র। আগ্রহী পাঠক আলিপুরে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রেস থেকে প্রকাশিত—The Bengal Excise Act পুস্তিকা পড়ে নিতে পারেন।)

এই আইন অনুযায়ী সরকারের কাছে যে সব জিনিসের জন্য আবগারি শুল্ক দিতে হবে সেগুলি হল—(ক) মানুষের খাওয়ার জন্য যে কোন 'লিকার' বা

(খ) মাদক কোন পদার্থ (কিন্তু ওষুধ হিসাবে বা প্রসাধনী হিসাবে ব্যবহৃত কোন পদার্থে যদি অ্যালকোহল বা মাদক পদার্থ থাকে, তবে সেগুলি এর অন্তর্ভুক্ত নয়)।

মাদক (intoxicant) বলতে বোঝায় (ক) যে কোন লিকার বা

(খ) যার থেকে লিকার পাতন করে তৈরি করা যাবে ও রাজ্য সরকার এই আইনের স্বার্থে যে সব পদার্থকে মাদক হিসেবে ঘোষণা করবেন, বা

(গ) মাদকতাকারী যে কোন 'ড্রাগ'।

লিকার বলতে বোঝায় মাদকতাকারী লিকার এবং স্পিরিট অব্ ওয়াইন, স্পিরিট, ওয়াইন, তাড়ি, পচুই, বীয়ার ও এই আইনের স্বার্থে যে সব পদার্থকে লিকার হিসাবে ঘোষণা করা হবে—এই সবগুলিই এর অন্তর্ভুক্ত।

স্পিরিট অব্ ওয়াইন মানে সাধারণ স্পিরিট (রাজ্য সরকার নির্ধারিত বা তার বেশি মাত্রার)।

স্পিরিটের অর্থ পাতন বা চোলাই করে পাওয়া অ্যালকোহল যুক্ত যে কোন লিকার—ডিনেচারড্ করা হোক বা না হোক। 'ডিনেচার' করার

অর্থ, মদ বা ওষুধ হিসেবে কিংবা অন্য কোন উপায়ে মানুষের খাওয়ার অনুপযুক্ত করার জন্য স্পিরিটের সঙ্গে অন্য কোন পদার্থ মিশিয়ে দেওয়া।

পচুই-এর অর্থ গেঁজিয়ে তোলা চাল, ভুট্টা বা অন্য কোন শস্য দানা (তাতে অন্য কোন তরল মেশানো হোক বা না হোক) এবং এর থেকে যে তরল পদার্থ পাওয়া যাবে—সেটিকে পাতলা করা হোক বা না হোক। তবে বীয়ার তার অন্তর্ভুক্ত নয়।

বীয়ার-এর মধ্যে পড়ে এল (ale অর্থাৎ মল্ট বা সীরা যুক্ত সুরা), স্টাউট, পোর্টার এবং মল্ট থেকে গেঁজিয়ে তৈরি যে কোন লিকার। (মল্ট মানে মদ চোলাই-এর জন্য তৈরি যব ইত্যাদি শস্যের মণ্ড।)

তাড়ির অর্থ, নারকেল, খেজুর, তাল বা অন্যান্য তালজাতীয় গাছের রস—গেঁজানো (fermented) হোক বা না হোক।

'তৈরি করার' অর্থ (ক) প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম যে কোন ভাবে আবগারি শুল্কের আওতার মধ্যেকার কোন পদার্থকে তৈরি করা (এর মধ্যে তাড়ি যে সব গাছ থেকে পাওয়া যায় সেগুলিকে 'ট্যাপ' করা ও তার থেকে তাড়ি বা রস সংগ্রহ করাও পড়ে) (খ) পাতন বা চোলাই করা (গ) বিক্রির জন্য লিকারকে রেকটিফাই করা, সুগন্ধি করা, রঙ করা বা মেশান অথবা লিকারকে পাতলা করা—এ সব কিছুই।

রাজ্য সরকারের অনুমতি ছাড়া অর্থাৎ লাইসেন্স না নিয়ে, বা শুল্ক অর্থাৎ ডিউটি না দিয়ে আবগারি শুল্ক দেওয়ার উপযুক্ত কোন পদার্থ রাখা, তৈরি করা, বটল করা, ব্রুয়ারী বা ডিস্টিলারী চালানো, বিক্রি করা, আমদানী বা রপ্তানী করা চলে না। লাইসেন্স আছে এমন কারো কাছ থেকে নিয়ে বা কিনে অবশ্য এগুলি রাখা যায়। কোন ক্লাব, মেস, সংস্থা, লজ বা অন্য কোন সংগঠন তার সদস্য বা অতিথিদের, টাকা বা চাঁদা নিয়ে বা না নিয়ে যদি লিকার সরবরাহ করে তবে সেটিকেও বিক্রি (sale) বলে গণ্য করা হবে।

তবে তাড়ি রাখা বা সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে কিছু ছাড় আছে, যেমন (ক) গুড় তৈরির উদ্দেশ্যে যদি তাড়ি সংগ্রহ করা বা রাখা হয় (খ) রুটি তৈরির কাজে যদি লাগানো হয়, তবে এর জন্যও অবশ্যই পারমিট লাগবে (গ) তাড়ি যদি শুধু বাড়িতে খাওয়ার উদ্দেশ্যে রাখা হয় এবং অবশ্যই তাকে মাদক হিসেবে বা মাদক পদার্থ তৈরির কাজে বা বিক্রির উদ্দেশ্যে কোন

কিছু বানাতে ব্যবহার করা চলবে না। (ঘ) নিজের গাছ থেকে সংগ্রহ করা ৪ সের পর্যন্ত তাড়ি রাখা যাবে, তবে এটিও সম্পূর্ণ বাড়ির ব্যবহারের জন্য, ইত্যাদি। এসব না হলে তাড়ি তৈরি করা, গাছ 'ট্যাপ' করা বা তাড়ি রাখার জন্য লাইসেন্স লাগবে।

আবগারি শুল্কযোগ্য পদার্থের বিক্রির কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে কিছু ছাড় আছে, যেমন (ক) কেউ যদি আইন মোতাবেক বিদেশী মদ (foreign liquor) ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য সংগ্রহ করে থাকে এবং নিজের জায়গা ছেড়ে চলে যাওয়ার সময় সে নিজে বা তারই পক্ষ থেকে কেউ যদি তা বিক্রি করে অথবা সে মারা গেলে তার কোন প্রতিনিধি যদি তা বিক্রি করে, (খ) যে গাছ থেকে তাড়ি সংগ্রহ করা হয়েছে সেই গাছের মালিক যদি আইন মোতাবেক তাড়ি সংগ্রহ করে থাকে এবং তৈরি বা বিক্রির লাইসেন্স আছে এমন কাউকে সে যদি ঐ তাড়ি বিক্রি করে, (গ) আইন মোতাবেক সংগ্রহ করা তাড়ি যদি গুড় তৈরির উদ্দেশ্যে কাউকে বিক্রি করা হয়, (ঘ) রুটি তৈরির কাজে তাড়ি ব্যবহার করার লাইসেন্স আছে এমন কাউকে যদি আইন মোতাবেক সংগ্রহ করা তাড়ি রুটি তৈরির কাজে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে বিক্রি করা হয়, (ঙ) তাড়ির ঐ ধরনের বিক্রি, যদি সে তাড়ি আইন মোতাবেক সংগ্রহ করা হয়ে থাকে এবং বাড়ির ব্যবহারের জন্য খাবার বানানোর উদ্দেশ্যেই শুধু ব্যবহার করা হয় এবং যদি না সে তাড়ি কোন মাদক পদার্থ হিসেবে বা মাদক পদার্থ তৈরির উদ্দেশ্যে বা বিক্রির জন্য কোন কিছু বানানোর উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়।

জটিল আইনী ভাষার মারপ্যাঁচের মধ্য থেকে মোদ্দা কথা এটিই যে, বাড়ির খাওয়ার জন্য নিজের গাছ থেকে খেজুর রস বা তালের রস সংগ্রহ করা যায়। কিন্তু বিক্রি করা প্রকৃত পক্ষে বেআইনী। তবে এক্ষেত্রেও আইনের বিশাল ফাঁক রয়েছে—যে কিনছে সে নিজের বাড়িতে খাবে বলেই কিনছে, সেটি প্রমাণ করা শক্ত নয়, তাহলেই কোন শাস্তির প্রশ্ন নেই। যে কিনছে সে যে তাকে গেঁজিয়ে মদ তৈরি করবে না, সেটি প্রমাণ করা, ঐ রকম উকিলের পাল্লায় পড়লে, অবশ্য বেশ শক্তই হতে পারে।

এই ধরনের ফাঁক সব ক্ষেত্রেই রয়েছে। যেমন আইনে আছে, কোন মিলিটারি ক্যানটনমেণ্টের এলাকার মধ্যে ও তার থেকে একটি নির্দিষ্ট দূরত্বের মধ্যে লিকার তৈরির বা বিক্রির লাইসেন্স দেওয়া যাবে না। আর

এই দূরত্ব ঠিক করে দেওয়ার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের কিন্তু এক্ষেত্রেও কম্যান্ডিং অফিসারের অনুমতি আগে নিয়ে নিতে পারলে কোন দোষ হবে না।

চাকরির ক্ষেত্রে নির্দেশ আছে যে, বিদেশী বা দেশী মদ বিক্রির লাইসেন্স আছে এমন কেউ—মাইনে দিয়ে বা না দিয়ে, কাজের সময়, কাজের এলাকার মধ্যে, বা যেখানে মদ খাওয়া হয় সেখানে, কোন মহিলাকে বা ১৪ বছর বয়সের নিচে কোন বাচ্চাকে চাকরি বা কাজ দিতে পারবে না। এখানেও নানা কৌশলে, নানা ফাঁক দিয়ে, অন্তত মহিলাদের লাগানোর ব্যাপারটা বেশ ভালভাবেই চালু আছে।

দরকার হলে মদের দোকান তাড়াতাড়ি বাধ্যতামূলকভাবে বন্ধ করে দেবার জন্যও আইন আছে। শান্তি রক্ষার উদ্দেশ্যে জেলা শাসক, বা মহকুমা শাসক বা কলকাতায় চিফ্ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট বা কমিশনার অব্ পুলিশ, লিখিত নোটিশ দিয়ে লাইসেন্স যুক্ত কোন মদের দোকানও বন্ধ করে দিতে পারেন। আবার আবগারি শুল্কের আওতার মধ্যে পড়ে এমন সব জিনিস বিক্রি হয় যে দোকানে, সেই দোকানের কাছে যদি দাঙ্গা বা বেআইনী সমাবেশ ঘটে বা ঘটার আশংকা থাকে তবে কনস্টেবল পদমর্যাদার ওপরের কোন পুলিশ অফিসার ঐ জায়গায় উপস্থিত থেকে, যে সময়ের জন্য তিনি প্রয়োজনীয় মনে করবেন, ঐ সময়ের জন্য ঐ দোকান বন্ধ করে দিতে পারেন।

এই ধরনের অজস্র আইন রয়েছে, মাঝে মাঝে তার সংশোধনীও হয়। এইসব সংশোধনের ফলে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেছে আইন লঙ্ঘনকারী-দের শাস্তির ক্ষেত্রে।

আবগারি শুল্কের আওতায় মধ্যেকার জিনিসপত্র তৈরি, বিক্রি, রাখা, আমদানী বা রপ্তানি করায় আইন লঙ্ঘন করলে শাস্তি ছিল দু'বছর পর্যন্ত জেল এবং ৫০০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা। (হ্যাঁ, ১৯০৯ সালের মূল্যমান অনুযায়ীই ৫০০০ টাকা!) কিন্তু ১৯৬৫ সালে বেঙ্গল এক্সাইজ (অ্যামেন্ডমেন্ট) এ্যাক্ট-এর ৩৩ ধারা মোতাবেক-এ শাস্তি কমিয়ে করা হয় ৬ মাস পর্যন্ত জেল অথবা এক হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা অথবা উভয়ই। স্বাধীনদেশের আইন লঙ্ঘনকারীদের উৎসাহিত করার এরকম ব্যবস্থাও হয়তো দেশে সুরাপান বা সুরাসক্তি বেড়ে যাওয়ার পেছনে

উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। দেশী মদকে বিদেশী মদ বলে চালানোর চেষ্টা করলে আগে শাস্তি ছিল এক বছর পর্যন্ত জেল বা ২000 টাকা পর্যন্ত জরিমানা বা উভয়ই। ১৯৬৫ সালে তা কমিয়ে করা হয়েছে ৬ মাস জেল ও ২00 টাকা জরিমানা।

আরো কিছু অপরাধের ক্ষেত্রেও শাস্তি কমানো হয়েছে। এ ধরনের কিছু অপরাধ হল—আবগারি লাইসেন্সধারী কোন ব্যক্তি বা তার প্রতিনিধি হিসেবে তার কোন কর্মচারী যদি নিম্নোক্ত অপরাধ করে,

(ক) তার লাইসেন্সের আওতার এলাকার মধ্যে মহিলাকে কাজ দেয় বা কাজ করতে অনুমতি দেয়, বা

(খ) ইতিমধ্যেই মত্ত বা নেশাগ্রস্ত কাউকে আবগারি শুল্কের আওতার মধ্যেকার কোন পদার্থ বিক্রি করে, বা

(গ) আপাতভাবে যে বাচ্চার বয়স ১৬ বছরের কম (আগে ছিল ২১ বছর) তাকে যদি স্পিরিট বা মাদক দ্রব্য (ড্রাগ) বিক্রি করে বা দেয়—ঐ বাচ্চাটি নিজেই খাক বা অন্য কারোর খাওয়ার জন্য নিক এবং বিক্রেতার এলাকার মধ্যেই হোক বা বাইরেই হোক, তাহলেও, বা

(ঘ) বিক্রেতা যদি তার এলাকার মধ্যে মাতলামি, নেশা, উল্টোপাল্টা আচরণ বা জুয়োখেলা অনুমোদন করে, বা

(ঙ) জামিনের অযোগ্য অপরাধ করার ফলে অভিযুক্ত হয়েছে বলে কাউকে, বা বেশ্যা বলে কাউকে সে জানে বা ঐ হিসেবে তাদের মনে হওয়ার যথেষ্ট কারণ থাকে এবং তা সত্ত্বেও যদি সে তাদের নিজের এলাকার মধ্যে থাকতে দেয় বা কারো সঙ্গে দেখা করতে দেয়—তা সে আবার অপরাধ করার জন্য বা বেশ্যাবৃত্তি করার জন্য হোক বা না হোক, তাহলেও।

আগে এসবের জন্য শাস্তি ছিল ৬ মাস জেল বা ২000 টাকা জরিমানা বা উভয়ই। এখন তা কমিয়ে শুধু সর্বাধিক ৫00 টাকা পর্যন্ত জরিমানা করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, এক্ষেত্রে ঐ লাইসেন্সধারী ব্যক্তি যদি প্রমাণ করতে পারে যে, সে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিটিকে যথেষ্ট বাধা দিয়েছিল, যেমন ইতিমধ্যেই মত্ত কাউকে আর মদ না দেওয়ার চেষ্টা করেছিল, তাহলেও তার শাস্তি মকুব হবে।

এইভাবে নানা বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো কায়দায় করা হয়েছে এসব আইন। এসবের ফলে সুরা ব্যবসায়ীদের রমরমা ব্যবসার কোন ঘাটতি

হয় না। সুরাপানের ব্যাপকতা কমানোরও কোন চেষ্টা হয় না। আর আইন রক্ষকদের বিপুল অংশের অসততা—ব্যাপারটিকে করে তোলে আরো ভয়াবহ ও হাস্যকর। আইনকারীদেরও রয়েছে অনিচ্ছা ও আন্তরিকতার অভাব।

এই অনিচ্ছার আস্কারাতে মদের দোকানগুলো কিভাবে ফাঁপিয়ে তোলা হয়, তার একটি নিষ্ঠুর সামাজিক প্রতিচ্ছবি পাওয়া যাবে গিরিশচন্দ্র ঘোষ-এর 'প্রফুল্ল' (১৮৮৯) নাটক থেকে। মদের নেশার কারণে পারিবারিক সর্বনাশে বিপর্যস্ত জ্ঞানদা বলছে—

> "আমি কি করবো বোন, সহরে অলিতে গলিতে শুঁড়ীর দোকান, কিনে খেলেই হল। আহা! কোম্পানির রাজ্যে এত হচ্ছে, যদি মদের দোকানগুলো তুলে দেয়, তা হলে ঘরে ঘরে আশীর্বাদ করে আর লোকে ভাতার-পুত নিয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে ঘর করে।
>
> প্রফুল্ল ॥ হঁ্যা, দিদি, কোম্পানি কেন দিক না?
>
> জ্ঞানদা ॥ ও বোন, তোমার আমার কথায় কি তুলে দেবে? শুনেছি শুঁড়ী পোড়ারমুখোরা কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা দেয়। অত টাকা কি ছাড়বে বোন?"

'কোম্পানির' পরিবর্তে 'স্বাধীন দেশের সরকার'-কে বসালেও ১০০ বছর আগের এসব কথা, এ সামাজিক ছবি এখনো অপরিবর্তিত, সমানভাবে প্রযোজ্য। 'শুঁড়ী পোড়ারমুখোরা কাঁড়ী কাঁড়ী টাকা' শুধু কোম্পানি বা ইংরেজ সরকারকেই দেয় নি, এখনকার রাজ্য বা কেন্দ্রীয় সরকারকেও দিয়ে চলেছে। একদিকে বাড়ানো হচ্ছে নানা সামাজিক সমস্যা অর্থাৎ সৃষ্টি করা হচ্ছে মদের মত নেশার চাহিদা, অন্যদিকে আইনের সাহায্যে প্রকৃতপক্ষে সুরক্ষিত করা হচ্ছে মদের ব্যবসা, এবং এসব নেশার সামগ্রীকে করে তোলা হচ্ছে সহজলভ্য—'অলিতে গলিতে শুঁড়ীর দোকান'। এর ফলে দেশের, বিশেষত গরীব ও মধ্যবিত্ত হাজার হাজার পরিবারে 'ভাতার-পুত নিয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে ঘর' করা আর হয় না। আর এভাবেই,—উত্তর-প্রদেশের আলমোড়ার ঐ আন্দোলনকারীদের ভাষায়,—চেষ্টা করা হয়, "জনগণকে এমন নেশায় বুঁদ করে" রাখতে "যাতে তারা নিজেদের আসল সমস্যা সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা না করতে পারে এবং সুস্থ জীবনের জন্য নিজের অধিকার আদায় ও প্রতিষ্ঠা করার জন্য সচেষ্ট না হতে পারে"।